দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

কৃপা কল্পতরু
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
— পৃঃ ২৩

‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্ধশতবর্ষ
মাতৃভূমির বন্দনায় জাতির
জাগরণ — পৃঃ ৩৫

৭৮ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা।। ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।। ১৩ পৌষ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ১৩ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৯ ডিসেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

রাজ্যে হিন্দু ঐক্যের বড়ো বিপদ 'তেজপাতা' আর 'কাঁঠালের আমসত্ত্ববাদী'রা স্বজন হারানো শ্মশানে

☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

বুনো ওলে বাঘা তেঁতুল ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

সর্দার প্যাটেলের সেকুলার নীতি ছিল ভারতীয়ত্ব সম্পৃক্ত ☐ বলবীর পুঞ্জ ☐ ৮

'বাংলাদেশ' সমস্যার সমাধান কী ? ☐ কৌটিল্য ☐ ১০

হুমায়ুনের হুংকার দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক ☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ১১

যারা ভারতবর্ষকে ভাঙ্গতে চায় ☐ মন্দার গোস্বামী ☐ ১৩

বাংলাদেশে নির্বাচন মানেই সংখ্যালঘু নির্যাতন, হামলা ☐ ১৫

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজনৈতিক পরিবর্তনের আশায় দিন গুনছেন

☐ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য ☐ ১৭

সনাতনী সৌকর্যে বোল্ড আউট ডিসেম্বর-জানুয়ারির ঔপনিবেশিক দিনক্ষণ ☐ শীর্ষ আচার্য ও ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ১৯

কৃপা কল্পতরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ☐ রবিব্রত ঘোষ ☐ ২৩

অপার লীলাময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ☐ দীপক খাঁ ☐ ৩১

কল্পতরু বর্ণন : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি এবং অক্ষয়কুমার সেন

☐ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৩৩

'বন্দে মাতরম্'-এর সার্ধশতবর্ষ : মাতৃভূমির বন্দনায় জাতির জাগরণ ☐ ধর্মানন্দ দেব ☐ ৩৫

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ স্থিতিশীল উন্নয়নের এক শাশ্বত দৃষ্টিভঙ্গি ☐ ড. জয়ন্ত চৌধুরী ☐ ৩৭

রাজনৈতিক চাপে পিষ্ট বিএলও-রা ☐ অজয় ভট্টাচার্য ☐ ৩৯

আমার স্মৃতিতে সঙ্ঘ পরিক্রমা ☐ অরুণ কুমার মহন্ত ☐ ৪৩

'বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব' পুস্তকে বাঙ্গালিকে আয়না দেখিয়েছেন ডাঃ কালিদাস বৈদ্য ☐ তাপস দে ☐ ৪৮

গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **অঙ্গনা : ২১** ☐ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ☐ **সমাবেশ সমাচার : ২৫-৩০** ☐ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ☐

প্রকাশিত হবে ৫ জানুয়ারি ২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৫ জানুয়ারি ২০২৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সঙ্ঘশতবর্ষে বক্তৃতামালা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ২১ ডিসেম্বর কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত বক্তৃতামালায় সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত সমাজের প্রবুদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নিকট সঙ্ঘকে উপস্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে দেশ, জাতি, সমাজ ও বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সঙ্ঘের অবস্থান পরিষ্কার করেন মোহনজী।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় সম্পূর্ণ বক্তৃতামালা ও প্রশ্নোত্তরগুলো ছাপানো হবে। সংখ্যাটি একটি সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০্) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

চৈতন্যোদয়ের বাণী

পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি এক মহাসংকটের মধ্য দিয়া যাইতেছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি স্তব্ধ, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, শিক্ষা তথা শিক্ষা ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবনমন এবং রাজনৈতিক নৈরাজ্য শুধু ভারতে নহে সমগ্র বিশ্বে পশ্চিমবঙ্গ তথা বাঙ্গালিকে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। এই নৈরাজ্যের সূচনা অবশ্যই বাম শাসনকালে। বাঙ্গালি নকশালবাড়ির মাওবাদীদের সন্ত্রাসও দেখিয়াছে। তাহা প্রশমিত হইলেও শাসন ক্ষমতা দখল করিয়া দীর্ঘ তিন দশকের অধিক সময় পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্জলি যাত্রার সূচনা করিয়াছে বৈদেশিক মতাদর্শজারিত বামদলগুলির মিলিত সরকার। উত্তরে নৈহাটি হইতে দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত গঙ্গার দুই তীরবর্তী কলকারখানায় যে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হইত, দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসরের বাম শাসনে লাল ঝান্ডার দলগুলি তাহাতে লালবাতি জ্বালাইয়া তাহাদিগকে পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত করিয়াছে। একইভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প সর্বক্ষেত্রে অন্ধকারের সূচনা করিয়াছে। সেই অন্ধকার হইতে মুক্তি লাভের অভিপ্রায়ে বাঙ্গালি বামেদের বিদায় জানাইয়া বর্তমান শাসক দলকে বরণ করিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই বাঙ্গালির মোহভঙ্গ ঘটিল। বর্তমান শাসক দল বামেদের চাইতেও ভয়ংকর রূপে তীব্রগতিতে পশ্চিমবঙ্গ তথা বাঙ্গালিকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিল। বিগত এক দশকের অধিক সময়ে তাহারা তাহাদের শাসনে রাজ্যটির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত করিয়া ফেলিয়াছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় ভারত সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির পথে চলিলেও পশ্চিমবঙ্গ এক অন্ধকার যুগে নিমজ্জিত হইয়াছে। বাঙ্গালি ইহা হইতে মুক্তির পথ খুঁজিতেছে। এইরূপ অবস্থা পরাধীনতার কালে ইংরাজ শাসক কর্তৃক হইয়াছিল। বিশ্বগুরু ভারতের অবস্থা দীনহীন করিয়াছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ। বাঙ্গালি সেই সময় পথ হারাইয়াছিল। তাহা হইতে পরিত্রাণের জন্য এই বঙ্গভূমিতে নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষী। তখন কলকাতাকে কেন্দ্র করিয়া বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হইয়াছিল। ভক্তি আন্দোলন, সমাজ সংস্কার, আধুনিক শিক্ষা, নারী শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি নানা কর্মযজ্ঞ শুরু হইলেও ইসলামের প্রসার এবং খ্রিস্টমতের বহুল প্রচার ও ধর্মান্তরণ বাঙ্গালিকে এক ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত করিয়াছিল। ঠিক এমন সময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কলকাতায় আগমন। কলকাতার তথাকথিত শিক্ষিত লোকেদের অনেকেই তাঁহার লোকশিক্ষার পদ্ধতিকে পাগলামি মনে করিয়াছিল। তিনি তো শুধু রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত ভবতারিণী মন্দিরের পূজারি হিসাবে থাকেননি। তিনি তাঁহার ভক্তগণের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে চৈতন্যোদয়ের আশীর্বাদ প্রদান করিয়াছেন। তিনি যুগপুরুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। 'তোমাদের চৈতন্য হোক' ইহা শুধু তাঁহার ভক্তদিগের প্রতি আশীর্বাদ ছিল না, তাহা ছিল বাঙ্গালির আত্মোপলব্ধির জাগৃতি এবং সত্যের পথে পরিচালিত হইবার আশীর্বাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীকার রিচার্ড শিফম্যান ('রামকৃষ্ণ ঃ এ প্রফেট ফর দ্য নিউ এজ' পুস্তকের লেখক) যথার্থই বলিয়াছেন যে, মানুষ এক অন্ধকার সময়ে দাঁড়াইয়া ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছেন মানুষকে অন্ধকার হইতে আলোর পথে লইয়া যাইবার জন্য। ইহা বাস্তব যে বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিও এক অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থা হইতে উত্তরণের একমাত্র পথ শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী স্মরণ। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মহাবাণীকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই যেকোনো বিরুদ্ধতার, যেকোনো দুর্বলতার, যেকোনো নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার সাহস প্রাপ্ত করা যায়। সমগ্র বাঙ্গালির আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে এমন কথা বলা যায় না। কেননা লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালি কল্পতরু দিবসে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সমবেত হইয়া থাকেন শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করিতে। পঁচিশ ডিসেম্বর লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালি স্বামীজী এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের ত্যাগব্রতকে স্মরণ করিয়া জীবন আলোকিত করিয়া থাকেন। লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালি কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে স্বামীজীর ভারতধ্যানকে স্মরণ করিয়া পরম বৈভবশালী ভারত গঠনের স্বপ্নে মগ্ন হইয়া থাকেন। নরেন্দ্রনাথ তথা স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণ তো চাপরাশ দিয়াই রাখিয়াছেন, 'নরেন লোকশিক্ষে দিবে; ঘরে-বাইরে হাঁক দিবে।' তাঁহার আশীর্বাদেই তো স্বামীজী বাঙ্গালিকে আগামী দেড়হাজার বৎসরের রসদ দান করিয়া গিয়াছেন। তাহা আত্মজাগরণের, আত্মোপলব্ধির রসদ। কল্পতরু দিবসে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বাণী পাথেয় করিয়া আগামী পন্থা নিশ্চিত করিতে পারিলেই সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হইবে এবং তাহাতেই বাঙ্গালি তাহার হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে।

সুভাষিতম্

উদয়ে সবিতা রক্তো রক্তোশ্চাস্তময়ে তথা।
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতাম্ একরূপতা।।

অর্থ ঃ উদয় ও অস্তের সময় সূর্য লালবর্ণ ধারণ করে থাকে। সেরকমই মহাপুরুষরা সুখ ও দুঃখের সময় একই রূপ থাকেন। অর্থাৎ অবিচল থাকেন।

রাজ্যে হিন্দু ঐক্যের বড়ো বিপদ ‘তেজপাতা’ আর ‘কাঁঠালের আমসত্ত্ববাদী’রা

স্বজন হারানো শ্মশানে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

দু’টো ভুল কখনও একটা ঠিক-এর জন্ম দেয় না। সমাজ পরিবর্তনে ‘রাজনৈতিক পরিবর্তন’-নিরপেক্ষ নয়। তবে তা অপরিহার্যও নয়। সমাজ পরিবর্তনের পটভূমি তখনই তৈরি হয়, ‘রহস্যময় নীরবতা’ যখন শাসকের অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। আর তা ভাঙতে মানুষকে রাস্তায় নেমে আসতে হয়। বুদ্ধিমান মানুষকে তা বোঝাতে হয় না। সারা ভারত যখন হিন্দুভূমি, তখন পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম এটা হতে পারে না। রাজনৈতিক দলের তকমায় তৃণমূল কংগ্রেস রহস্যময় যন্ত্র। অন্যায় অবিচারকে গলাধঃকরণ করে তারা ভোটে জেতে। মোল্লাবাদী বাংলাদেশে এক বছরের বেশি সময় ধরে প্রবল আকার ধারণ করেছে হিন্দু নিধন যজ্ঞ। গত বছর আগস্ট মাসে বাংলাদেশে ইসলামিক মোল্লাবাদের উত্থানের পর থেকেই পররাষ্ট্রনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয় বলে দায় সেরেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন ভয়াবহ আকার ধারণ করলেও তা নিয়ে তিনি টুঁ শব্দও করেননি। উদ্দেশ্য হলো বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়ে তার প্রভাব রাজ্যের হিন্দু ভোটারদের ওপর থেকে কমিয়ে নিয়ে আসা। যাতে মুসলমান ভোটব্যাংক ধরে তিনি ২০২৬-এর ভোট নদী পার হতে পারেন। এই খেলা কংগ্রেস, বিদেশি বাম ও তৃণমূল অনেকদিন খেলছে। একশো দিনের কাজে দেশের শ্রমিককে মজুরির এককে পরিণত করেছিল কংগ্রেস। ‘দ্য বিকশিত ভারত— গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল, ২০২৫’, সংক্ষেপে ‘ভিবি— জিরামজি’ বিলে তা ঘুচেছে।

এই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস মুসলমান ভোটারদের তেজপাতার মতো ব্যবহার করে। ভেট পাওয়ার আশায় তারা তা নির্লজ্জভাবে মেনে নেয়। হানাদার বাবরের স্মৃতি উসকে তৃণমূল সরকারের এক তেজপাতা বিধায়ক হঠাৎ করে তার দলের ঘোর নিন্দা শুরু করেছে। মরা সাপকে বাঁচিয়ে তুলতে চাওয়ার মধ্যে এক গভীর চক্রান্ত লুকিয়ে রয়েছে। তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবিরকে দিয়ে হয়তো অচিরেই এক ভয়ংকর খেলায় নামবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী। হয়তো তাঁর লক্ষ্য হলো হুমায়ুন কবিরকে দিয়ে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্যে দিয়ে মুসলমান ভোটব্যাংক তুষ্টীকরণ এবং ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে মুসলমান ভোটের সম্পূর্ণ মেরুকরণ। কিছু সংবাদমাধ্যম এহেন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ‘তৃণমূল-বিরোধী’ হিসেবে ব্যাখ্যা করে আসন্ন নির্বাচনে মুসলমান ভোট তৃণমূল হারাতে পারে বলেও প্রচার করছে। বিভিন্ন বিধানসভা আসনে হুমায়ুনকে এগিয়ে রেখে, তৃণমূলকে পিছিয়ে রেখে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলকেই গর্তে ফেলার চেষ্টা করছে এই ধরনের সংবাদমাধ্যম। হাস্যকরভাবে অনেকে আবার বাঙ্গালি আর হিন্দু জাতিকে আলাদা আলাদা অস্তিত্ব বলে প্রচার করছে। এই কাঁঠালের আমসত্ত্বরাই হিন্দু ঐক্যের আসল পরিপন্থী। তাদের অতিক্রম করেই রাজ্যে সমাজ পরিবর্তনের ভাবনা গড়তে হবে। তারা ধর্মনিরপেক্ষতা আর হিন্দুত্বকে একাসনে বসিয়ে ভ্রান্ত ভাবনা সৃষ্টি করে। সুকৌশলে তারা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যে, ‘সেকুলারিজম’-এর অর্থ হলো ধর্মহীনতা। ‘হিন্দুত্ব’ হলো মূল্যবোধ ও উপলব্ধির সমন্বয়, আর সংবিধানে বর্ণিত সেকুলারিজম (যার অর্থ তারা বের করেছে— ধর্মনিরপেক্ষতা) যে দেশের প্রশাসন পরিচালনার অস্ত্র, তা তারা বোঝে না।

গত বছর আগস্ট মাসে বাংলাদেশে জেহাদি অভ্যুত্থানের পর এ বছর ডিসেম্বরে সেই দেশে দ্বিতীয় মোল্লাবাদী উত্থানের বলি হয়েছে নিরীহ শ্রমিক দীপু চন্দ্র দাস। হিন্দু বলে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে উন্মত্ত জেহাদি জনতা। সে নারকীয় উল্লাস সবাই দেখলেও তৃণমূলি বাহিনী তা দেখতে রাজি নয় মুসলমান ভোটের স্বার্থে। মোল্লাবাদী দেশটির রাষ্ট্রদূতের কাছে এই ঘটনার ব্যাখ্যা চেয়েছে ভারত সরকার। কিছু সুবিধাবাদী সেকু ফেকুর দল এই নৃশংসতাকে খাটো করে দেখাতে গ্রাহাম স্টেইনসের মৃত্যু এবং অযোধ্যার কলঙ্কিত ধাঁচা অপসারণের সঙ্গে তার তুলনা করছে। এদেরই একটি অংশ প্রকাশ্যে ইসলামিক জেহাদ ও মোল্লাবাদকে সমর্থন করে। বাংলাদেশে হিন্দু নিধন পর্ব, গ্রাহাম স্টেইনসের মৃত্যু এবং অযোধ্যার বিতর্কিত ধাঁচা অপসারণ হলো তিনটি আলাদা পরিস্থিতির ফসল যা আসলে এক নয়। সেই কলঙ্কিত ধাঁচা অপসারণের মাধ্যমে ভারতের হিন্দু জনগণ তাঁদের হারিয়ে যাওয়া অস্মিতা ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই রাজ্যেও প্রায় ১০-১৫ শতাংশ হিন্দু ভোটার রয়েছেন, যাঁদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তাঁরা হিন্দু। অচিরেই তাঁদের সে ভুল ভাঙবে। ভারতবর্ষের অন্য নাম হলো— ‘হিন্দুস্থান’। সেকুলাররা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, হিন্দু ভারতে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র অ-হিন্দু রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১২৫টি আসন মুসলমান অধ্যুষিত। আর ১৭০টি আসন রয়েছে যেখানে মুসলমান ভোটার ১৫ শতাংশের বেশি। তাতে হিন্দু ঐক্য ও সমন্বয়ের কোনো চিন্তার কারণ নেই। এ রাজ্যে হিন্দু ঐক্যের বার্তাবহ রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলটি কোনো তেজপাতা রাজনীতি করে না। বিজেপি নেতৃত্ব ঐক্যের রাজনীতি করেন। রাজ্য থেকে বিদেশি বামেদের চিরবিদায়ের পর যে আসনগুলিতে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই আসনগুলির দখল নিয়েছে তৃণমূল। আর সেই বুনিয়াদের ওপরেই ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে তারা। এ রাজ্যের মুসলমানরা কেন তৃণমূলকে ভোট দেয়, তার সঠিক ব্যাখ্যা কোনো মুসলমান ভোটার দিতে পারবে না। তারা ইমাম-মুয়াজ্জিমদের আদেশ নির্দেশে চলে। নিজেদের ভাবনায় তারা চলে না। ফলে তৃণমূল সরকারের থেকে তারা যা পাচ্ছে, তা মাপার মতো মস্তিষ্ক তাদের নেই। তারা কেবল সেটাই নেয় যা তাদের দেওয়া হয়। রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা স্বজন হারানো শ্মশানে হিন্দু ঐক্যের প্রতিষ্ঠা তাই জরুরি। এর সামাজিক প্রয়োজনীয়তা যতটা জরুরি, ঠিক ততটাই দরকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা। **(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)**

বুনো ওলে বাঘা তেঁতুল

অতিচালাকেষু দিদি,

তুমি চলো ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়। এই প্রবাদ বাক্যকে সত্যি করে চলেছে নির্বাচন কমিশন। এসআইআর-কে নিজেদের মতো করে নিতে প্রথম থেকেই আপনার দল তৃণমূল ভাড়াটে সংস্থা আইপ্যাককে ব্যবহার করবে ঠিক করেছিল। বিএলএ নিয়োগ থেকে বিএলও, ইআরও-দের কিনে নেওয়া বা ভয় দেখিয়ে কাজ করানোর প্ল্যান ছিল। কমিশন শেষবেলায় সব সিদ্ধান্ত জানানোয় একের পরে এক খেলায় হারতে হয়েছে তৃণমূলকে। শেষ চিন্তা ছিল শুনানির সময়ে খেলা। সেটাও বানচাল হয়ে গেছে। কেমন যেন মনে হচ্ছে, বুনো ওলকে হারাতে নেমেছে কমিশন নামের বাঘা তেঁতুল।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় গাফিলতির জন্য বিএলও-দের শোকজের ঘটনা বিরল নয়। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্য রাজ্যেও হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কমিশন এক ভোটারকে শোকজ করেছে। একই ব্যক্তি উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর এবং উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর— দুই বিধানসভা কেন্দ্রেই ভোটার হিসেবে অ্যানুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন। একটিতে নিজের সই। অন্য ফর্মটিতে অন্য একজনের। ধরা পড়ে যেতেই চিঠি পাঠিয়েছে কমিশন। দিদি, যা আইন দেখেছি, তাতে আপনার দলের কথা শুনে যাঁরা এসব করেছেন তাঁদের জেল হতে পারে। জরিমানাও মোটা অঙ্কের।

এই রাজ্যে যা যা ধরা পড়েছে তাতে কমিশনের কর্তারা অবাক দিদি। সে সব ধরতেই তো শুনানির কাজ রাজ্য সরকারি কর্মীরা করলেও নজর রাখছেন এবং নথি যাচাই করছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা। যাঁদের চাকরি যাওয়ার ভয় নেই।

আসলে পশ্চিমবঙ্গে যে সব নজির পাওয়া গিয়েছে তাতে কমিশনের চোখ কপালে। কোথাও ভোটারের চেয়ে তাঁর বাবা বা মা মাত্র ১৫ বছরের বড়ো। কোথাও আবার ঠাকুরদা বা ঠাকুমা ৪০ বছরেরও বড়ো নন। কোথাও ভোটারের সঙ্গে তাঁর বাবা-মায়ের বয়সের ফারাক ৫০ বছরেরও বেশি। আবার অনেক জায়গায় বদলে গিয়েছে বাবার নামই। আবার এমনও বহু ভোটার রয়েছেন যাঁদের বয়স ৪৫ বছরের বেশি, অথচ ২০০২ সালের তালিকায় নাম ছিল না। এমন ২০ লক্ষ ৭৪ হাজার ভোটারকে চিহ্নিত করেছে কমিশন। এই ভোটারদের বয়স এখন যদি ৪৫ বছরও হয়, তা-ও ২০০২ সালে তাঁদের বয়স হওয়ার কথা অন্তত ২২ বছর। সেক্ষেত্রে তাঁদের নাম কেন ওই সময়ের ভোটার তালিকায় ছিল না, তা খতিয়ে দেখতে চায় কমিশন। সত্যি দিদি অবাক করা সব চালাকি ধরা পড়ছে।

কমিশনের যা গতিপ্রকৃতি এবারের নির্বাচনে গণনা পর্যন্ত এমন অনেক নতুন নতুন নিয়ম দেখা যাবে। যাতে কাঁদতে হবে, কাঁদতেই হবে দিদি আপনাকে থুড়ি আপনার দলকে।

একটা মজার কাহিনি দেখলাম দিদি। মঙ্গলকোট ব্লকের শীতল গ্রামের ১৭৫ নম্বর বুথের ভোটার সরোজ মাঝির বয়স ৬৩ বছর। অথচ তালিকায় তাঁর ছেলে লক্ষ্মী মাঝি ও সাগর মাঝির বয়স ৫৯ ও ৫৮ বছর। অর্থাৎ পাঁচ বছর বয়সেই বাবা হয়েছিলেন সরোজ! ওই দুই ছেলে আসলে ছেলেই নয়। ২২ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল। ২০০৬ সালে, বাম আমলে স্থানীয় নেতাদের উদ্যোগে নাকি নাম ভোটার তালিকায় তোলা হয়।

তবে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয় নির্বাচন কমিশন। আগে ঠিক ছিল রাজ্য সরকারি কর্মীরাই সব নথি যাচাই করবেন। সেই মতো তৃণমূল ও আইপ্যাক বাহিনী প্রস্তুত ছিল। কিন্তু একেবারে শেষবেলায় কমিশন জানিয়ে দেয়, কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের বিভিন্ন শুনানি কেন্দ্রে মাইক্রো অবজার্ভার হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে। মাইক্রো অবজার্ভাররা মূলত এসআইআর-এর শুনানি পূর্বে ইআরও এবং সহকারী এইআরও কাজে নজর রাখছেন। অ্যানুমারেশন ফর্ম থেকে ভোটারদের জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র এবং শুনানির জন্য আসা অন্যান্য নথি যাচাই করছেন মাইক্রো অবজার্ভারেরাই। এছাড়া, ভোটার তালিকার অসঙ্গতি চিহ্নিত করা এবং পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণও তাঁদের দায়িত্বে। কমিশনের যা গতিপ্রকৃতি এবারের নির্বাচনে গণনা পর্যন্ত এমন নতুন নতুন নিয়ম দেখা যাবে। যাতে কাঁদতে হবে, কাঁদতেই হবে দিদি আপনাকে থুড়ি আপনার দলকে।

টেনশন তাই, বড়োই টেনশন আমার। □

অতিথি কলম

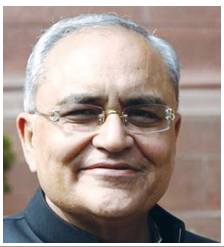

বলবীর পুঞ্জ

সর্দার প্যাটেলের সেকুলার নীতি ছিল ভারতীয়ত্ব সম্পৃক্ত

আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে 'বিকশিত ভারত'-এ পরিণত করার যে সংকল্প গ্রহণ করেছেন, তা ওই অসম্পূর্ণ কাজকে পূর্ণ করার চেষ্টা, যেখানে সর্দার প্যাটেলের আশীর্বাদ ও দিশানির্দেশ রয়েছে।

গত ৩১ অক্টোবর যুগপুরুষ ও স্বাধীন ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী সারা ভারতে পালিত হয়েছে। একটা প্রশ্ন আজও মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে— যদি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজী অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী চয়নের ক্ষেত্রে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ না করতেন তাহলে দেশের ভাগ্য অন্য পথে চালিত হতো। যদি ওই সময় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হতো এবং পরাজিত জওহরলাল নেহরু বিজয়ী ঘোষিত না হতেন তাহলে দেশে সেকুলারবাদী ধারণার স্বরূপ কী হতো? বর্তমান ভারতে প্রথমবার বড়োমাপের 'ভোট চুরি'-র স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন তৎকালীন সাংবাদিক দুর্গাদাস তাঁর লিখিত পুস্তক : 'India : From Curzon to Nehru and After'— এ।

স্বাধীনতার পর অবস্থার বদল হয়েছে হয়নি: ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যখন রক্তস্নাত বিভাজন-সহ আমাদের স্বাধীনতা এলো তখন স্বাভাবিকভাবে সকলে আশা করেছিল যে, মানসিক গোলামির শিকল ছিঁড়ে ফেলে দেবে দেশবাসী, যা বাহ্যিক ও বৌদ্ধিক দিক থেকে শত শত বছর ধরে ভারতকে বেঁধে রেখেছিল। যদি গান্ধীজী ও সর্দার প্যাটেলের মতো জাতীয় নেতারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো স্বাধীন ভারত নিজের বহুত্ববাদী সনাতন সভ্যতার মূলে নিজেকে জুড়ে রাখতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হয়নি। যে সমস্ত ঔপনিবেশিক শক্তি ৬০০-৮০০ বছর ধরে ভারতকে শাসন করল, তাদেরই মানসপুত্র স্বাধীন ভারতে দেশের নিয়ামক হয়ে শীর্ষস্থান দখল করলো। তিনি আর কেউ নয়, তার রক্তে কিছু ভারতীয় ভাবনা থাকলেও, নৈতিকতা ও বিবেকের দিক থেকে তিনি ছিলেন কলোনিয়াল হ্যাংওভারে আক্রান্ত। ব্যবহারজীবী দুর্গাদাস ও গান্ধীজীর দৃষ্টিতে নেহরু 'ইংরেজ' ছিলেন। বাস্তবে স্বাধীন ভারতের মূল চাবি নেহরুর হাতে চলে গেল, যিনি ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতাকে পূর্ণমাত্রায় ভারতের শাসন ব্যবস্থায় কায়েম করেছিলেন এবং ভারতকে 'রাষ্ট্র' না মেনে খ্রিস্টান মিশনারিদের মতান্তরণের কার্যকলাপকে সাংবিধানিক উৎসাহ দিতে লাগলেন। তার ফলে দেশের যে পরম্পরাগত আত্মা ও বৌদ্ধিক চেতনা জাগ্রত করা উচিত ছিল, সেই প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

ভারতীয় পরম্পরা হতে অনুপ্রাণিত প্যাটেলের সেকুলারবাদ : সর্দার প্যাটেলের সেকুলারবাদ ঔপনিবেশিক ধারায় জারিত নয়, বরং পক্ষনিরপেক্ষ ভারতীয় সনাতন পরম্পরার অনুসারী যেখানে বিবিধতাকে মান্যতা দেওয়া এবং সহজরূপে স্বীকার করা হয়েছে। এই প্রকার বৈদিক দর্শনকে সামনে রেখে ভারতের তৎকালীন হিন্দু-বৌদ্ধ শাসকরা কয়েক শতাব্দী ধরে ইহুদি, পার্সি, খ্রিস্টান, মুসলমানদের মতকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, অপরপক্ষে বর্তমান ভারতের সেকুলারবাদীরা এই মূল ভারতীয়ত্বের ধারণা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। এটি হলো বামপন্থী বিচারধারা— যার ঘোষিত উদ্দেশ্য হলো সেকুলারবাদের নামে মূল ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিনাশ করা। এইরূপ বিদেশি চিন্তনের ভিত্তিতে সেকুলারিজম কয়েক দশক ধরে ভারতে হিন্দুদেরকে বিভিন্ন জাতের ভিত্তিতে বিভাজন করে, চতুর্দিকে ঔপনিবেশিক বিমর্শ তৈরি করে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসমাজকে দুর্বল করছে এবং ধর্মান্তরণের সাহায্যে ইসলাম ও খ্রিস্টানদের অসহিষ্ণু ও কট্টরবাদী চিন্তাধারাকে ইন্ধন জুগিয়েছে।

সামাজিক সমরসতা ভিত্তিক প্যাটেলের সেকুলারবাদ : যদি স্বাধীন ভারতে সর্দার প্যাটেলের মতকে প্রাধান্য দেওয়া হতো তাহলে সোমনাথ মন্দিরের মতো অযোধ্যা বিবাদও কয়েক দশক আগেই সমাধান হয়ে যেত, কিন্তু বাস্তবে উলটোটা হলো। ১৯৪৯ সালের ২২-২৩ ডিসেম্বর অযোধ্যায় যখন বিতর্কিত কাঠামোর মধ্যে রামলালা প্রকট হলেন, তখন নেহরু রামলালার মূর্তিটি সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। ওইসময় স্থানীয় কোনো মুসলমান কিন্তু এর বিরোধিতা করেনি বা কোনো আইনগত আপত্তিও দাখিল করেনি। এই বিশেষ ঘটনার সাক্ষী কোনো হিন্দু ছিল না। এই ঘটনার সাক্ষী ছিল এক মুসলমান সুরক্ষাকর্মী আবদুল বরকত। সে স্বীকার করেছে যে শ্রীরামজন্মভূমির অধিকার হিন্দুদেরই। অভিরাম দাসের তথ্য অনুযায়ী (যিনি মূর্তি প্রকট মামলার বাদীপক্ষ ছিলেন)— ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের বারাবঁকি জেলার কহ্নীপুর গ্রামের একজন উদার মুসলমান কইয়ুম কিদুয়াই ৫০ একর জমি দান করেছিলেন। ওই স্থানে বাবা অভিরাম দাস একটি ভব্য হনুমান মন্দির স্থাপন করেছিলেন যা বর্তমানে তাঁর শিষ্যরা দেখাশোনা করছে। অযোধ্যা ছাড়াও সোমনাথ মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে নেহরুর আপত্তি ছিল। কিন্তু গান্ধীজী ও সর্দার প্যাটেল জীবিত থাকার কারণে সেই বাধা টেকেনি। ওই দুই মহাপুরুষের প্রয়াণের পরই নেহরুর হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ প্রকট হতে লাগল। এমনকী মন্দির নির্মাণের কাজ দেখাশোনা করছিলেন বলে তাঁর মন্ত্রী কেএম মুন্সীকে তিনি তিরস্কার করেন এবং ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে মন্দির উদ্বোধনে যেতে নিষেধ করেন। এই প্রসঙ্গে ২০০৭ সালে আরও একবার সামনে আসে নেহরুবাদী কংগ্রেস সরকারের হিন্দুবিরোধী চরিত্র। সেই সময় ইউপিএ সরকার সর্বোচ্চ আদালতে লিখিতভাবে জানায় যে, ভগবান

শ্রীরাম কাল্পনিক চরিত্র। কংগ্রেসের এই মানসিকতার দরুন কাশী, মথুরার বিষয়টি সমাধান করা সম্ভবপর হয়নি। বিষয়গুলি আজও আদালতে বিচারাধীন। যদি দেশ সর্দার প্যাটেলের চিন্তাধারায় পরিচালিত হতো, তবে কয়েক দশক ধরে চলা বিবাদ, সাম্প্রদায়িক টানাপোড়েন, অকারণ রক্তপাত, সম্পত্তি বিনাশের মতো ভয়ংকর ঘটনা ঘটতো না।

সর্দারের নীতি মানলে কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতো : যদি নেহরু কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের বিষয়টি সর্দার প্যাটেলের হাতে দিতেন তাহলে ভারত এক বড়ো সংকট থেকে বেঁচে যেত। সর্দার প্যাটেলের কারণেই ভারতের মধ্যে ৫৬২টি ছোটো রাজ্যের বিলয় সম্ভব হয়েছে, কিন্তু জম্মু-কাশ্মীর বিষয় নেহরু নিজের হাতে রেখেছিলেন বলে শেখ আবদুল্লার মতো ঘোর সাম্প্রদায়িক নেতার প্রভাবে কাশ্মীরের ভারতভুক্তির বিষয়টি প্রভাবিত হয়েছে। প্যাটেলের দৃষ্টিতে জম্মু-কাশ্মীর অন্যান্য রাজ্যের মতোই একটি রাজ্য ছিল এবং কাশ্মীরকে তিনি দেশের সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে দেখতেন। কিন্তু নেহরু জম্মু-কাশ্মীরকে মুসলমানবহুল হওয়ার কারণে বিশেষ বিষয় হিসেবে দেখতেন এবং ভারতের মধ্যে এই রাজ্যের বিলয় নিয়ে টালবাহানা করছিলেন। ১৯৫২ সালের ২৪ জুলাই তিনি লোকসভায় স্বীকার করেছিলেন যে, মহারাজা হরি সিংহ অন্য রাজ্যের মতো দেশভাগ-সহ স্বাধীনতার একমাস আগেই বিলয়ের অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত রাজ্যের জনতার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে কাশ্মীরে জনমত সংগ্রহের প্রসঙ্গ এসে গেল, ধারা ৩৭০ ও ৩৫এ-র মতো বিশেষ অধিকার চালু হলো, বিষয়টি রাষ্ট্রসঙ্ঘের হাতে গেল এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের হটানোর আগেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হলো। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কংগ্রেস নেতা সদাশিব কনৌজী পাতিল নিজের পুস্তক— 'মাই ইয়ার্স উইথ কংগ্রেস'-এ লিখেছেন, 'যদি কাশ্মীরের বিষয়টি সর্দার প্যাটেলকে দেওয়া হতো, তাহলে এই সব ঘটনা ঘটত না, কারণ সেই সময় ভারতে এইরকম সমস্যা সামলানোর সঠিক পরিস্থিতি ছিল। যদি কাশ্মীরের মতো জুনাগড় ও হায়দরাবাদের বিষয়টি নেহরুর হাতে থাকত, তাহলে সেটাও পাকিস্তানের হাতে চলে যেত এবং এই এলাকাগুলি আজও পাকিস্তানের অধীনে থাকত।'

যদি কাশ্মীরের সমাধান সর্দার প্যাটেলের মাধ্যমে হতো তাহলে ওখানেও অন্য রাজ্যের মতো স্থায়ী সমাধান হতো। এক-তৃতীয়াংশ কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তানের দখল থাকতো না। দেশের সুরক্ষায় যে সমস্ত ভারতীয় সেনা জওয়ান সীমান্তে পাহারা দিচ্ছে, তাদের উপর পাথর ছোঁড়া হতো না। অমুসলমানদের পরিচয় জেনে হত্যা করা হতো না বা কাশ্মীর উপত্যকার রাজনীতিতে পাকিস্তান হস্তক্ষেপ করতে পারতো না। ১৯৮৯-৯০ সালে কাশ্মীরি হিন্দুদের নরসংহার ও অপমান পূর্বক পলায়নের মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটতো না। এমনকী রাষ্ট্রহিতের প্রতিকূল ও দেশবিরোধী সন্ধি— 'সিন্ধু জল চুক্তি' সম্পাদিত হতো না, যার জন্য তখন খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য পাকিস্তানকে তখন ৬.২ কোটি টাকা পর্যন্ত (বর্তমানের অঙ্কে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা) অনুদান দিয়েছেন নেহরু। তারপরেও পাকিস্তান শোধরায়নি; উলটে ১৯৬৫ সালে তারা ভারত আক্রমণ করে। কারণ পাকিস্তানের বৈচারিক ভাবনা হলো 'কাফের নিধন'। ইসলাম নির্দেশিত কাফেরমুক্ত পৃথিবী গড়ার ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার আঘাতে ভারতকে রক্তাক্ত করার স্বপ্নে তারা যে বিভোর।

প্যাটেল পাকিস্তানের মানসিকতা জানতেন :

লৌহপুরুষ সর্দার প্যাটেল পাকিস্তানির বিচ্ছিন্নতাবাদকে ভারতের একতার সংকট হিসেবে দেখেছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক সন্দেহ সাধারণ কোনো 'ইসলামফোবিয়া'-র কারণে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই সন্দেহের উৎস ছিল ১৮৭০-৮০— এই কালখণ্ডে ভারতবর্ষের বুকে সংঘটিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা। ওই সময় সৈয়দ আহমদ খান দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ বপন করে মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে আচরণ এবং ইংরেজের প্রতি আনুগত্য দেখানোর কর্তব্য করতে বলেছিলেন। পরিণামে মুসলমান সম্প্রদায়ের বড়ো অংশ স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে ছিল। হিংসাত্মক খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯-২৪) এই মনোভাবকে আরও প্রবল করেছে এবং তা মোপলা হিন্দু নরসংহার (১৯২১-২২) এবং ১৯৪৬-এর জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ওই নির্বাচনে মুসলিম লিগকে ভোট দেওয়ার কারণই ছিল 'পাকিস্তানের দাবি'কে সমর্থন করা। গোটা দেশে ৪৯২টি মুসলমান সংরক্ষিত আসনে মুসলিম লিগ প্রার্থী দেয় এবং তার মধ্যে ৪২৯টি (৮৭ শতাংশ) আসলে জয়লাভ করে লিগ। স্বয়ং জিন্না 'পাকিস্তান' নামক প্রস্তাবিত ইসলামিক পবিত্রভূমির অন্তর্গত করাচি, লাহোর বা রাওয়ালপিণ্ডি থেকে প্রার্থী না হয়ে বর্তমান মুম্বইয়ের 'ভায়খালা' আসনে নির্বাচিত হয়েছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মুসলমানদের বড়ো অংশ মজহবি কারণে পাকিস্তানের সমর্থক ছিল, কিন্তু দেশভাগের পরে তারা খণ্ডিত ভারতে থেকে কংগ্রেসে শামিল হয়ে নিজেদের 'সেকুলার' বলতে লাগল।

হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রমাণে চেষ্টা করে নেহরু সেকুলারবাদ : মার্কস- মেকলে প্রভাবিত ভারতের বর্তমান সেকুলারবাদ কয়েক দশক ধরে জেহাদি আক্রমণের স্বীকার হিন্দুসমাজকে 'অপরাধী' হিসেবে চিহ্নিত করছে। এটা বোঝা যায় ১৯৫৯ সালের ১৮ মে নেহরু যখন মুখ্যমন্ত্রীদের পত্র লিখে জানিয়েছিলেন যে, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের এবং মুসলমান সম্প্রদায় প্রকৃতিগতভাবে আক্রমণকারী নয়। এটা সত্য নয় কি— বিগত এক হাজার বছর ধরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন মতাবলম্বীরা সংকীর্ণ একেশ্বরবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে; জেহাদিদের দ্বারা হত্যা ও ধর্মান্তরণের শিকার হচ্ছে? সর্দার প্যাটেল স্বয়ং কট্টর মুসলমান সম্প্রদায়ের হিংসার শিকার হয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে গুজরাটের ভাবনগরে মসজিদে লুকিয়ে থাকা জেহাদিরা তাঁর উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ করে। সেই যাত্রায় তিনি কোনোক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। এই ঘটনাকে নেহরুপন্থীরা যতই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করুক, সর্দার প্যাটেল বুঝেছিলেন কট্টর মজহবি উন্মাদনার প্রতি চোখ বুজে থাকা দেশের পক্ষে কত বড়ো বিপদ হতে পারে। এই জন্য তিনি ৩ জানুয়ারি ১৯৪৮ কলকাতায় প্রশ্ন তুলেছিলেন, হিন্দুস্থানে যে মুসলমানরা রয়েছে, তাদের অধিকাংশই এক সময় পাকিস্তান সৃষ্টিতে মত দিয়েছিল। বর্তমানে রাতারাতি কীভাবে মন বদলালো তা বুঝতে পারি না। তিন দিন পর ৬ জানুয়ারি লক্ষ্ণৌতে সর্দার প্যাটেল বলেন— ভারতীয় অংশে পাকিস্তান আক্রমণ করলে মুসলমানরা নিন্দা করছে না কেন? ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণকারীদের নিন্দা করা তাদের কর্তব্য নয় কী?

আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে 'বিকশিত ভারত'-এ পরিণত করার যে সংকল্প গ্রহণ করেছেন, তা ওই অসম্পূর্ণ কাজকে পূর্ণ করার চেষ্টা, যেখানে সর্দার প্যাটেলের আশীর্বাদ ও দিশানির্দেশ রয়েছে। কিন্তু নেহরুবাদী নীতির সঙ্গে এখনও দেশকে লাগাতার লড়াই করতে হচ্ছে এবং বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার একে একে সমাধান হচ্ছে। যদি স্বাধীন ভারতের লাগাম নেহরুর জায়গায় সর্দার প্যাটেলের হাতে থাকতো, তবে তার বহু শতাব্দী ব্যাপী ক্ষয়িষ্ণু বৈভব বা হৃতগৌরব অনেক আগেই পুনরুদ্ধারে সক্ষম হতো ভারত।

(লেখক রাজ্যসভার পূর্বতন সাংসদ ও বরিষ্ঠ সাংবাদিক)

‘বাংলাদেশ’ সমস্যার সমাধান কী?

জেহাদিদের দ্বারা সংঘটিত হিন্দু নরসংহারের মধ্যে দিয়ে ১৯৪৭ সালে বিভাজিত হয় ভারত। এরপর প্রায় ৭৮ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে অব্যাহত রয়েছে হিন্দু নির্যাতন, গত বছর আগস্ট মাসে ঢাকায় জেহাদি অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ জুড়ে যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই সমস্যার সমাধান কী? অনেকেই হয়তো বলবেন যে, পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে কমপক্ষে এক কোটি বাংলাদেশি হিন্দুকে আশ্রয় দিতে হবে। প্রশ্ন হলো, এত সংখ্যক শরণার্থীর ভরণ-পোষণের দায় ভারত সরকারকে নিতে হলে আয় ও ব্যয়ের মডেলটি ঠিক কী হওয়া উচিত?

দেশভাগ হয় অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের মুসলিম লিগ শাসকদের গণহত্যার জন্য। রক্তাক্ত বিভাজনের শিকার হয় পঞ্জাবও। পঞ্জাবে হিন্দু-শিখ ও মুসলমানদের জনসংখ্যা বিনিময় এবং পারস্পরিক জায়গা পরিবর্তন হলেও, ভারতের সেকুলার নেতারা রাজি না হওয়ায় মুর্শিদাবাদ-মালদার মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গে থেকে যায় এবং পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ হিন্দুরা থেকে যায় পূর্ব পাকিস্তানে। এরপর ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতন শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে। ১৯৪৭, ’৫০, ’৬৪, ’৭১, ’৯২, ২০০১-এ বারবার হিন্দুরা দেশ ছাড়ে এবং আশ্রয় দিতে বাধ্য হয় ভারত। এর সঙ্গে ভারত সরকারের কাঁধে চাপে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের খরচ। এছাড়াও ’৭১-পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ গঠনে বিপুল আর্থিক সাহায্য করে ভারত সরকার। অথচ এর ফল শূন্য! বর্তমানে ভারতের প্রতি ভয়ংকর বৈরীমনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে মহম্মদ ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন বাংলাদেশ সরকার। হিন্দু নির্যাতন প্রবল আকার ধারণ করায় আরও এক কোটি হিন্দু হয়তো বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হবে। কিন্তু এবার ভারতের সময় এসেছে এতদিনের ক্ষতিপূরণ আদায়ের। এই সুযোগ বড়োই দুর্লভ এবং হাতছাড়া করা একদমই উচিত নয়। কিন্তু কীভাবে আদায় হবে এই ক্ষতিপূরণ? কোন ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনে ভারতের পক্ষে সম্ভবপর হবে এই পরিমাণ ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার?

অবশ্যই কৌটিল্য দর্শনে। একদা মগধ সাম্রাজ্য, ষোড়শ মহাজনপদ-সহ সমগ্র আর্যাবর্ত যা অনুসরণ করত, বর্তমানে রাশিয়া, চীন, ইজরায়েল, আমেরিকা— সব শক্তিশালী দেশই যা অনুসরণ করে, ভারতের এবার সেই দর্শনের শরণাপন্ন হওয়ার সময় এসেছে। গান্ধী দর্শনের পরিবর্তে কৌটিল্য দর্শনের প্রয়োগে আদায় হবে সব ক্ষতিপূরণ। ভারতকে বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে দাঁড়াতে হবে। ঠিক যেভাবে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন দাঁড়িয়েছেন ইউক্রেনের রুশদের পাশে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে হয়তো ‘লিমিটেড ওয়ার’ বা সীমিত যুদ্ধের প্রয়োজন। প্রতিটি যুদ্ধের একটা খরচ রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বসম্মত নিয়মানুসারে যে দেশ যুদ্ধ হারে, সেই দেশকেই যুদ্ধের খরচ বহন করতে হয়। যুগে যুগে এটাই হয়েছে। এমনকী বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত দু’টি বিশ্বযুদ্ধেও। আর সেই কারণেই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পাঁচবার ভাবা উচিত। ২০২২-এর পর রাশিয়া ইউক্রেনের প্রায় অর্ধেক জায়গা দখল করে নিয়েছে দুটো কারণে। এক, ইউক্রেনের রাশিয়ান সংখ্যালঘুদের বাঁচাতে; দুই, সরাসরি মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে।

এবার ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘাতের ইতিহাস পর্যালোচনা করা যাক। ১৯৪৭-এ পশ্চিম এশিয়া থেকে ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পর ১৯৪৮ সালে আত্মপ্রকাশ করে একটি দেশ, যার নাম— ‘ইজরায়েল’। রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রথমে ইহুদিদের ৫৫ শতাংশ এবং মুসলমানদের ৪৫ শতাংশ জমি দিলে ইহুদিরা রাজি হয়। কিন্তু এই দেশের মোট জমির এহেন বিভাজন মেনে নেয়নি মুসলমানরা। ইজরায়েল গঠিত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই পাঁচটি আরব দেশ (মিশর, সিরিয়া, ইরাক, জর্ডন, লেবানন) সদ্যোজাত দেশটিকে আক্রমণ করে। ঠিক একইভাবে ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হওয়ার পরই কাশ্মীর আক্রমণ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ চলে বেশ কিছুদিন। যুদ্ধে আরব দেশগুলিকে হারিয়ে বেশ কিছু অংশ নিজের করে নেয় ইজরায়েল। ওয়েস্ট ব্যাংক থাকে জর্ডনের নিয়ন্ত্রণে এবং গাজা থাকে মিশরের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৪৯-এ হারার পরও মিশর ও জর্ডন কিন্তু প্যালেস্তাইনের হাতে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভূখণ্ড তুলে দেয়নি। ১৯৬৭, ১৯৭৩ ও ২০০৬-এ প্যালেস্তাইনের সঙ্গে সংঘাতের পর ইজরায়েল একই কাজ করে। একদা সিরিয়ার দখলে থাকা গোলান হাইট্‌সের দখল নেয় ইজরায়েল ১৯৬৭ সালে। ২০২৩-এর ৭ অক্টোবরের জেহাদি হামলার পর গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাংক দখলে উদ্যত হয়েছে ইজরায়েল। যুদ্ধের খরচ হিসেবে জমি দখল হলেও এক্ষেত্রে জমির সঙ্গে ইজরায়েলকে দায় নিতে হয় বহু প্যালেস্তাইনবাসীর। এই প্যালেস্তাইনবাসীরা সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করত বলে তারা শরণার্থীর মর্যাদা পেলেও ইজরায়েলে কোনো নাগরিক অধিকার কিন্তু পায়নি।

জওহরলাল নেহরু নেতৃত্বাধীন সরকারের দুর্বল প্রতিরক্ষা নীতির কারণে ১৯৬২ সালে আকসাই চীন দখলে নেয় মাওয়ের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট চীন। তার আগে ১৯৪৮-এ পাকিস্তানকে হারানোর পরও উলটে সেই পাকিস্তানকেই আধা কাশ্মীর উপহার দেন নেহরু। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারত যুদ্ধে জিতলেও দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে চুক্তি করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও হিন্দু শরণার্থীদের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়ে ভারতে। ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনাকেও বিনা শর্তে মুক্তি দেয় ভারত সরকার। বিনিময়ে কিছু না নিয়ে সিমলা চুক্তিতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরও ফেরত দেয় ভারত। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ভারতের সেভেন সিস্টার্স (অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য)-কে বোমার আঘাতে ধ্বংস করার কথা বলছে। চিকেন নেক দিয়ে ঢুকে কলকাতা, এমনকী দিল্লি পর্যন্ত দখল করার কথা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্বের মুখে শোনা যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের দিক থেকে ভারতের ওপর আক্রমণ সংঘটিত হলে সীমিত যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে এক কোটি হিন্দু জেহাদিদের হাতে পণবন্দি হয়ে রয়েছে।

যদি বাংলাদেশের এক কোটি হিন্দুকে উদ্ধার করার জন্য ভারতকে সেনা নামাতে হয়, অথবা ওই এক কোটি হিন্দু বাংলাদেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যশোর, খুলনা, রংপুর, সিলেট ও চট্টগ্রামের ভারতভুক্তির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবতে হবে। ভারত সরকার সেই চিন্তাভাবনা না করলে ইউনুস, পিনাকী ভট্টাচার্যদের কাছে তা হবে এক বিরাট উপহার। কারণ বাংলাদেশের হিন্দুদের জায়গা-জমি, সম্পত্তি পুরোটাই চলে যাবে জেহাদিদের করালগ্রাসে। □

হুমায়ুনের হুংকার দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক

আনন্দ মোহন দাস

গত ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় 'নারায়ে তাকবির, আল্লাহো আকবার' স্লোগান তুলে বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের নামে জেহাদি শক্তির আস্ফালন দেখা গেল। তৃণমূলের ভরতপুরের এমএলএ হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে সৌদি আরবের দুই জন মৌলবির হাত ধরে বিনা বাধায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করা হলো। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা নামক বিষবৃক্ষের বীজ পল্লবিত হলো। বাবরি মসজিদের নামে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের খেপিয়ে তোলার ষড়যন্ত্র রচিত হলো। তিনি রগরগে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উগরে দিয়ে যে ভাষায় কথা বলে চলেছেন তা পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। হুমায়ুন কবির অঙ্গীকার করেছেন, পলিটিক্স বাই বাই করলেও তিনি বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেই ছাড়বেন। এই হুংকারের মাধ্যমে তিনি দেশের শাসন ব্যবস্থা ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে জেহাদি শক্তিকে আবারও আবারও উসকে দিয়েছেন।

আইন অনুযায়ী মুসলমানরা মসজিদ তৈরি করতেই পারে। এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু বাবরের নামে মসজিদ তৈরি করার মধ্যেই অশনি সংকেত লক্ষ্য করা গেছে। হিন্দু সমাজের ভাবাবেগকে আঘাত করার জন্য বাবর হিন্দু মঠ মন্দির ধ্বংস করে লুটের নেতৃত্ব দিয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র মঠ মন্দিরকে নিশানা করে বাবর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে। অনেক জায়গায় মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরি করেছে। খুন, ধর্ষণ ও ধর্মান্তরণের নেতৃত্ব দিয়েছে। সেই রকমই অযোধ্যায় সে শ্রীরামমন্দিরকে ধ্বংস করে তার উপর মসজিদের একটি বিতর্কিত ধাঁচা তৈরি করেছিল। এর বিরুদ্ধে হিন্দুরা ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে লড়াই চালিয়ে গেছেন। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপামর হিন্দু সমাজ রুখে দাঁড়িয়েছে। বহু মানুষ শ্রীরামমন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য আত্মবলিদান করেছেন। অবশেষে ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের সর্বসম্মতিক্রমে দেওয়া রায়ে শ্রীরামমন্দির পুনর্নির্মাণের আদেশ পেয়েছেন। বহুদিনের সংগ্রামের ফলে হিন্দুরা তাদের আরাধ্য দেবতাকে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত বহু দিনের বিবাদের নিষ্পত্তি করে যথার্থ রায় দিয়েছে।

ইতিমধ্যে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের ভব্য মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং হিন্দু সমাজের স্বপ্ন পূরণ রয়েছে। দীর্ঘ দিনের বিদেশির কলঙ্কিত চিহ্ন মুছে ফেলা সম্ভব হয়েছে। শ্রীরামমন্দির পুনর্নির্মাণে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ ও ভারতীয় অস্মিতার পুনর্জাগরণ ঘটেছে। স্বাভিমানবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। স্ব-এর জাগরণ ঘটেছে। বাবর ছিল বিদেশি আক্রমণকারী ও মন্দির ধ্বংসকারী, যা সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ইতিমধ্যে প্রমাণিত।

সেই লুণ্ঠনকারী, অত্যাচারী ও বিদেশি আক্রমণকারীকে মহিমান্বিত করতে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় হুমায়ুন কবির দ্বারা বাবরের নামে মসজিদ নির্মাণের শিলান্যাস দেশদ্রোহিতার শামিল। এমনকী সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অবমাননা। এই ধরনের দুঃসাহস হুমায়ুন কবিরের মতো লোক ভারতের একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেই করতে পারে। মুসলমানদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে বিপজ্জনক রাজনীতির ভয়ংকর পরিণাম ঘটতে পারে। মজহবের নামে জেহাদি শক্তিকে একত্রিত করে আস্ফালন দেখানোর সাহস হুমায়ুন কবির পায় কী করে? সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বিদ্বেষ ছড়ানোর পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। এই হুমায়ুন কবির অনেক দিন আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে মুর্শিদাবাদে তারা ৭০, হিন্দুরা ৩০ শতাংশ, প্রয়োজনে হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেবেন। এই হলো তৃণমূলের জনপ্রতিনিধির সাম্প্রদায়িক ও ঘৃণ্য মানসিকতার নিদর্শন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় তার সাহস বেড়েছে। এমনকী ভোটের রাজনীতিতে মজহবের নামে মুসলমান সমাজকে উসকে দিয়ে বিষোদ্গার করে চলেছেন। মুসলমানরাই আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠবেন বলে দাবি করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, তার এই বাড়বাড়ন্ত হলো কী করে? অনেকেই অভিযোগ করছেন, শাসকদলের প্রচ্ছন্ন মদত না থাকলে তার এই ধরনের দুঃসাহস হতে পারে না। অনেক দেরিতে শাসকদল দল তাকে সাসপেন্ড করলেও শিলান্যাসের বিরুদ্ধে কোনোরকম প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় গত ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের নামে তাঁর গোপন অভিপ্রায় জনসমক্ষে ব্যক্ত করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। কোথায় গেলেন সেকু, মাকু, তৃণু ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল, যারা শ্রীরামমন্দিরের শিলান্যাসের বিরোধিতা করেছিলেন। এরাই মন্দিরের পরিবর্তে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ নির্মাণের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। কিন্তু বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের সময় মুখে কুলুপ এঁটেছেন। হুমায়ুন কবিরের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস দেখাননি। তাহলে কি হিন্দুর বিরোধিতা করাই সেকুলারিজমের মূল মন্ত্র? তা নাহলে এক্ষেত্রে তাদের নীরবতার কারণ কী?

ফঃ ২

হুমায়ুন কবির বাবরি মসজিদের নামে দেশ বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা দান সংগ্রহও করেছেন। শিলান্যাসের আগেই ঘোষণা করেছিলেন এই কাজে দেশ বিদেশ থেকে ৮০ কোটি টাকা অর্থের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন। এর পিছনে আন্তর্জাতিক কোনো চক্রান্ত জড়িত থাকলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই ফান্ড কি ভোটের রাজনীতিতে কাজে লাগবে? এই ধরনের পরিকল্পনা হঠাৎ করে কখনো সম্ভব নয়। মনে হয় তৃণমূলে থেকেই তিনি অনেক দিন ধরে এই ধরনের পরিকল্পনা করেছিলেন। তা না হলে গত ৬ ডিসেম্বর দূরদূরান্ত থেকে আসা লোকজনের এই ধরনের জমায়েত করা সম্ভব ছিল না। এর পিছনে কাদের মদত রয়েছে তার তদন্ত হওয়া খুব দরকার। তিনি বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করে ভারতীয়ত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। মুসলমান সমাজকে উসকে দিয়ে বাবরি মসজিদ প্রতিষ্ঠার নামে প্ররোচিত করে ভোটের রাজনীতি করেছেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে ভোটের রাজনীতির ভয়ংকর নোংরা খেলা শুরু করেছেন। এমনকী তিনি বেলডাঙ্গায় ৬ ডিসেম্বরের জমায়েতে লোকসমাগমে উৎসাহিত হয়ে ঘোষণা করেছেন যে তিনি অচিরেই মুসলমান স্বার্থে নতুন দল গঠন করবেন এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁরা মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় ১৩৫টি আসনে প্রার্থী দেবেন।

ইতিমধ্যে তিনি দাবি করেছেন ৯০টি আসনে মুসলমান প্রার্থীরা জয়লাভ করে সরকার গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে এবং সরকারকে তারাই পরিচালনা করবে। এ তো ভয়ংকর দাবি! তিনি প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বলেছেন এখন মুসলমান ৩৭ শতাংশ এবং বাবরি মসজিদ নির্মাণের পর সংখ্যাটি ৪০ শতাংশ হয়ে যাবে। কোনো দলই নাকি তাদের বাদ দিয়ে সরকার গঠন করতে পারবে না এবং তাদের অঙ্গুলি হেলনেই সরকার চলবে। এর পরের দাবি কী সহজেই অনুমেয়। এরা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মূলত মুসলমান অধ্যুষিত কেন্দ্রগুলিতে প্রার্থী দিয়ে মুসলমান আবেগ ও মজহবি জিগির তুলে নির্বাচনে লড়বে বলে ঘোষণা করেছে। এতো সেই মুসলিম লিগের দাবির প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সমগ্র সমাজ থেকে মুসলমানদের পৃথক করার মানসিকতা সমাজে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেবে। এর ফলে আগামী দিনে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ কলুষিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। আইন শৃঙ্খলার সমস্যাও ঘটতে পারে। বৃহত্তর ইসলামিক 'বাংলা' গঠনের আওয়াজ উঠলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। একসময় ব্রিটিশ শাসক মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে পৃথক করে বঙ্গকে ভাগ করার চক্রান্ত করেছিল।

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৯০৫ সালে সমগ্র হিন্দু সমাজ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করতে ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং ইংরেজদের এই চক্রান্তে শামিল হয়ে মুসলিম লিগ বঙ্গভঙ্গের ওকালতি করেছিল। এমনকী মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলির স্বায়ত্তশাসনও দাবি করেছিল। পরবর্তীকালে এরাই দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা বলে হিন্দু ও মুসলমানকে দু'টি পৃথক জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে এবং একটি পৃথক জাতি হিসেবে মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূখণ্ডের দাবি করে। সেই কারণেই ১৯৪৭ সালে মুসলিম লিগের দাবি মেনে জিন্নার নেতৃত্বে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। সেই ধরনের মানসিকতার প্রতিফলন এখন হুমায়ুন কবিরের দাবির মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

কিছুদিন আগে কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরীও আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন যে আগামীদিনে মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও দিনাজপুর-সহ মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হবার দাবি করতে পারে। কারণ এই জেলাগুলিতে ইতিমধ্যে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশের ফলে এই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করতে হবে। নইলে দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে রাজ্যের জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এর ফলে রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় হারের চেয়ে অনেক বেশি। অবিলম্বে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রুখতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। তাই দেশের স্বার্থে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে দেশের সামনে আগামীদিনে সমূহ বিপদ নেমে আসবে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি বজায় রাখতে হুমায়ুন কবিরের মতো সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির রাজনৈতিক কার্যকলাপ রুখতে না পারলে ভবিষ্যতে রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠবে। এই সমস্ত জেলাগুলিতে হিন্দুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে এবং নির্যাতনের শিকার হবে। ভবিষ্যতে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের হত্যার মতো ঘটনা নিরন্তর ঘটতে থাকবে। তাই দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দলের এই ধরনের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বন্ধ করতে এগিয়ে আসা উচিত। □

মকর সংক্রান্তি উৎসবের শুভক্ষণে
বনবাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে
বস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন—

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

যারা ভারতবর্ষকে ভাঙ্গতে চায়

মন্দার গোস্বামী

'উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষম তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।।

অর্থাৎ সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে যে বিস্তৃত ভূভাগ, তার নাম ভারতবর্ষ এবং সেখানকার অধিবাসীদের ভারতীয় বলা হয়। সুপ্রাচীন উন্নত সভ্যতার অধিকারী এই দেশ সর্বদা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ছিল। শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য ধন-সম্পদ, সর্ব ক্ষেত্রে ভারতবাসী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষ অনেক স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত থাকলেও এই ভারতীয় দেহের অন্তরাত্মা ঐতিহাসিক ভাবেই হিন্দুত্ব। হিন্দুত্বের কারণেই এই বিস্তৃত ভূভাগ শুরু থেকেই সাংস্কৃতিকভাবে এক ও অখণ্ড ছিল। কিন্তু এরপর ভারতের সম্পদের লোভে, বাইরে থেকে একের পর এক বিদেশি হানাদার আসতে থাকে। আমরা বার বার আক্রান্ত হই। লুঠ করা হয় আমাদের ধন সম্পদ। আসে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক বিদেশি চিন্তাধারা। তার বিষময় ফলের কারণে অখণ্ড ভারতবর্ষ ক্রমশ খণ্ডিত হতে থাকে। সপ্তদ্বীপের জম্বুদ্বীপ ভারতবর্ষ অবশেষে পরিণত হয় 'ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত' নামক ভূখণ্ডে। আজও ভেতরের-বাইরের অনেক বিভেদকামী শক্তি— ব্রেকিং ইন্ডিয়া গ্রুপ, টুকরে টুকরে গ্যাং প্রভৃতি ভারতবর্ষকে ভাঙতে চায়, ভারতের অন্তরাত্মা হিন্দুত্বকে ধ্বংস করে দেশকে টুকরো টুকরো করতে চায়।

এক্ষেত্রে প্রথমেই যে নামটি আসে, সেটি র‍্যাডিক্যাল ইসলাম। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন কাসেমের নেতৃত্বে আমাদের দেশে প্রথম ইসলামিক আক্রমণ হয়। তারও প্রায় ১০০ বছর আগে ইসলামের জন্ম, আর জন্মের সময় থেকেই ইসলাম বিস্তারে শুরু হয় জেহাদ। জেহাদ, অর্থাৎ ইসলামে অবিশ্বাসীদের নির্বিচারে হত্যা। দার-উল-হার্বকে পরিণত করতে হবে দার-উল ইসলামে। যেকোনো ইসলামিক শাসনে হিন্দুরা জিম্মি, কাফের, তাদের জিজিয়া কর দিয়ে বাঁচতে হবে। কাফেরদের সম্পত্তি, লুঠপাট নারী ধর্ষণে কোনো পাপ নেই, বরং আছে পুণ্য। একসময় ইসলাম ভারতে শুধু লুটপাট করতে এসেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তারা ভারতভূমি দখল করতে শুরু করে। তাদের মজহব জোর করে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়— হয় তরবারি নয় কোরান। ফলে বহু হিন্দু ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়। অনেককে হত্যা করা হয়। শক, হুন, দল, কুষাণ এরা ভারতীয় সমাজ জীবনে ধীরে ধীরে বিলীন হলেও পাঠান মোগলরা কিন্তু কখনোই মিশে যায়নি। বরং তারা পরবর্তীকালে স্বাধীন ইসলামিক আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ তৈরি করে নিয়েছে। সেই মানসিকতার যারা এখনও ভারতে আছে, তারা আজও স্বপ্ন দেখে ভারতকে টুকরো করে প্রতিষ্ঠিত হবে আরও ইসলামি দেশ এবং শরিয়তি শাসন।

আজ সমগ্র বিশ্বে প্রায় ৭০টির ওপর আন্তর্জাতিক ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে। ISIS, বোক হারাম, তালিবান, আল কায়দা-সহ আমাদের দেশেও রয়েছে লস্কর-ই-তৈবা (এলটি টি), জৈশ-ই-মোহম্মদ, হিজবুল মুজাহিদিন রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ) : আল-উমর- মুজাহিদিন। এদের একমাত্র লক্ষ্য, কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তানের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে নেই। এখানে রয়েছে সিমি Student Islamik Movement of India, পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া। আনসার উল্লা বাংলা টিম, জামায়াতুল মুজাহিদিন। সঙ্গে রয়েছে রোহিঙ্গারা এদের লক্ষ্য হলো পশ্চিমবঙ্গের একটা বড়ো অংশ নিয়ে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠন। সন্ত্রাসবাদীদের একটাই লক্ষ্য, সমগ্র ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের মাধ্যমে হিন্দু মনে আতঙ্ক তৈরি করা, যাতে তারা ভিটে মাটি ছেড়ে এলাকা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার-সহ অশিক্ষিতদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কয়েকদিন আগেই দিল্লির ঘটনায় তা সবাই প্রত্যক্ষ করেছে।

এর পরের বিভাজনকারী শক্তিটি হলো, 'খ্রিস্টান সাম্রাজ্যবাদ'; জর্জ বার্নার্ড 'শ বলেছিলেন, কোনো দেশ দখলের আগে খ্রিস্টানরা সেখানে মিশনারি, ক্রস, বাইবেল পাঠায়, তারপর পাঠায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ভারতে প্রথম এসেছিল যেসুইট মিশনারিরা। একটু পা শক্ত করবার পর এরা ধর্মান্তরণের মাধ্যমে বনবাসী, গিরিবাসী, তথাকথিত জনজাতিদের তাদের নিজ ধর্মসংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করে। আসে ব্রিটিশরা। তারা দেখল যে ভারতের হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি তাদের সভ্যতার থেকেও অনেক অনেক প্রাচীন। তখন ভারতবর্ষে তক্ষশীলা নালন্দার মতো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত গীতা রচিত হয়েছে। বিজ্ঞান, গবেষণা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ পৃথিবী শ্রেষ্ঠ ছিল, তখন ইউরোপীরা নরমাণ্ডির উপকূলে উলঙ্গ ঘুরে বেড়াত, কাঁচা মাংস খেত।

স্বাভাবিকভাবেই এটা তাদের সহ্য হলো না। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ মেকলের বক্তব্য— 'if you want to destroy a nation first destroy history...'। এই ফর্মুলাতেই আমাদের প্রকৃত ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করল। মেকলে বলেছিলেন, আমরা এদেশে এমন শিক্ষা প্রবর্তন করতে চাই, যাতে ভারতীয়রা দেহে ভারতীয় হলেও চিন্তায় হবে ইংরেজ'। কাজে লেগে গেল খ্রিস্টান মিশনারিরা। তারা তাদের স্কুলের মাধ্যমে ভারতীয়দের সংস্কৃতিকে হেয় করে খ্রিস্টীয় সংস্কৃতির গুণকীর্তন শুরু করল।

এলেন ম্যাক্সমুলার। ব্রিটিশ ল্যাবে তৈরি হলো আর্য অনার্য তত্ত্ব। আর্যরা এদেশে বহিরাগত, অনার্যরাই হচ্ছে দেশের আদি বাসিন্দা। নানান ছল-চাতুরী, লোভ দেখিয়ে, সেবার আড়ালে ধর্মান্তরণের মাধ্যমে একটা এলাকার বড়ো অংশ যখন খ্রিস্টান হয়ে গেল, তখন তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো অস্ত্র। শুরু হলো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের বড়ো অংশ এক সময় খ্রিস্টান উগ্রবাদীদের কবলে ছিল। খ্রিস্টান উগ্রবাদী

সংগঠন NSCN, মিজোফ্রন্ট, NLFT, PLA. MNCA, এরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলেও হিন্দু বিরোধিতায় এককাট্টা। এদের লক্ষ্য স্বাধীন খ্রিস্টান ভূখণ্ড। এখন কিছুটা দুর্বল হলেও শিক্ষা সংস্থান, অন্যান্য বিদেশি ফান্ডের সাহায্যে আজও খ্রিস্টান সংগঠনগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদে মদত দিয়ে চলেছে।

পরবর্তী শক্তিটি 'কালচারাল মার্ক্সিজম্'।

কমিউনিজম ভারতের যতটা ক্ষতি করেছে অন্যরা ততটা ক্ষতি করতে পারেনি। এরা প্রথম দিকে ইংরেজ বিরোধী হলেও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেই জার্মানি সোভিয়েত আক্রমণ করল, সঙ্গে সঙ্গে এরা ইংরেজ বন্ধু হয়ে গেল। হিটলারের মার খেয়ে ইংরেজদের গদি যখন টালমাটাল, তখন তারা ব্রিটিশ অনুগত চর। পাড়ায় কোনো বিপ্লবী থাকলে থানায় গিয়ে তার খবর দিয়ে আসতো। ব্রিটিশদের যুদ্ধকে নাম দিল জনযুদ্ধ। এদের পত্রপত্রিকায় নেতাজীকে বলা হলো তোজোর কুকুর, সাম্রাজ্যবাদের দালাল, কুইসলিং, অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন বুর্জোয়া কবি। স্বামী বিবেকানন্দ বেকার, শ্রীরামকৃষ্ণদেব পাগল, মৃগীরোগী। এরাই মুসলিম লিগের সঙ্গে দাবি তুলেছে পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের একটা বড়ো অংশ পূর্ব পাকিস্তানে চলে যেত। আমরা অনেকেই 'কাশ্মীর ফাইল' সিনেমা দেখেছি, সেখানে একটা কথা ছিল— 'সরকার যার-ই হোক না কেন, সিস্টেম আমাদের'। স্বাধীনতার পর বামপন্থীরা সরকারের সমস্ত সিস্টেমে ঢুকে পড়েছে। ইতিহাস কংগ্রেস, বিজ্ঞান কংগ্রেস, এশিয়াটিক সোসাইটি, টিভি, ফিল্ম, নাটক, সব জায়গায় ঢুকে এরা যেভাবে দেশ বিরোধী বিকৃত ইতিহাস রচনা করেছে, সেই ন্যারেটিভ মুছতে এখনো অনেক সময় লাগবে। চীন যখন ভারত আক্রমণ করে, তখন এরা চীনের পক্ষ নিয়ে ধর্মঘট ডেকে আমাদের সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহ লাইন ব্যাহত করেছে। সগর্বে বলেছে চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। সাহিত্য, নাটক, সর্বক্ষেত্রে এদের শুধু হিন্দুত্ব বিরোধিতা।

বইয়ে ঢোকানো হলো ব্রিটিশ নির্মিত আর্য-অনার্য তত্ত্ব, মার্ক্সবাদ। ১৮৫৭ সালে জাতীয় সংগ্রাম হয়ে গেল, সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের বিদ্রোহ। জনজাতি দলিতদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হলো বিচ্ছিন্নতাবাদের বিষ। বলা হলো তোমরা হিন্দু নও। এরপর 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' বলে যে সংগঠনের জন্ম, তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যেই মারামারি কাটাকাটি করে আরও সংগঠনের জন্ম দিল। নকশালবাদ, মাওবাদ এদের থেকেই সৃষ্ট। যাদের একমাত্র কাজ উন্নয়নের বিরোধিতা করা, সমাজে অস্থিরতা তৈরি করা। আজও রেললাইন, রাস্তা ধ্বংস, মানুষ হত্যা, অপহরণ, বোমা বিস্ফোরণ করে এরা মার্ক্সবাদ, মাওবাদ, লেনিনবাদের নাম বৃদ্ধি করে চলেছে। কিছুদিন আগে এদেরই ছাত্র সংগঠন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লোগান দিয়েছে— 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনশাল্লা, ইনশাল্লা'। সংসদ আক্রমণকারী আফজল গুরুর ফাঁসির সময় এরাই স্লোগান দিয়েছে— 'কিতনে আফজল মারোগে, ঘর ঘর সে আফজল নিকলেগা,'। 'আফজল হাম শরমিন্দা হ্যায়, তেরা কাতিল আভি ভি জিন্দা হ্যায়'। ইদানীং দলিত-মুসলিম ফ্রন্ট নাম দিয়ে হিন্দুদের মধ্যে বিভেদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের যখন সংসদে কিছু ক্ষমতা ছিল তখন সংসদ খুললেই কয়েক জনের কাজই ছিল সাংসদদের সই সংগ্রহ করা, উদ্দেশ্য, দেশভক্ত সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করতে হবে। এছাড়াও রয়েছে আরবান নকশাল নামক কিছু শহরভিত্তিক অতিবাম কর্মী, তথাকথিত শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী এবং মানবাধিকার কর্মী, যাদের একমাত্র কাজ ভারত-বিরোধী শক্তিগুলিকে বিভিন্নভাবে আইনি সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদান।

এরপর নাম করা যেতে পারে খালিস্তানিদের। খালিস্তান টাইগার ফোর্স, খালিস্তান লিবারেশন ফোর্স, বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল, আন্তর্জাতিক শিখ যুব ফেডারেশন বিদেশি শক্তি দ্বারা পরিচালিত। এদের সকলেরই উদ্দেশ্য ভারতকে টুকরো করা। এছাড়া ভেতরে- বাইরে রয়েছে ডিপস্টেট, যারা সরকারের বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে নির্দিষ্ট অ্যাজেন্ডা চালায়। এদের ক্ষমতা এতই বেশি যে, এরা কিছু ক্ষেত্রে কোনো দেশের সরকার পর্যন্ত উলটে দিতে পারে। ভারতে বেশ কিছু সাংবাদিক, রাজনৈতিক গোষ্ঠী, সংগঠন, বুদ্ধিজীবী এদের সঙ্গে যুক্ত। আছে বেশ কিছু ভারত- বিরোধী ফাউন্ডেশন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সোরোস নেটওয়ার্ক। জর্জ সোরোস এবং তার ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন দ্বারা অর্থায়িত সোরোস নেটওয়ার্ক বিশ্বের ১২০টিরও বেশি দেশে সক্রিয়। মুখে গণতন্ত্র, মানবাধিকারের কথা বললেও ভারতে সোরোসের একমাত্র কাজ, ভারতীয় সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং ভারতীয় মূল্যবোধকে বিনষ্ট করা। আছে রক ফেলার সোসাইটি, এশিয়া সংস্থা, হিউম্যান রাইটস ল নেটওয়ার্ক।

পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (যারা মাঝরাতে সুপ্রিমকোর্ট খুলিয়ে ১৯৯৩-এ মুম্বই বিস্ফোরণে দায়ী ইয়াকুব মেমনের মৃত্যুদণ্ডের পুনর্বিবেচনা চেয়েছিল) নবসর্জন ট্রাস্ট, সত্যাগ্রহ ফাউন্ডেশন, সাবরং ট্রাস্ট, অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস, লোকনীতি— সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ এবং সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ উল্লেখযোগ্য। এদের প্রায় সকলের বিরুদ্ধেই আর্থিক অনিয়ম, দেশবিরোধী কার্যকলাপ, বিদেশি ফান্ড, টুলকিটস মাধ্যমে দেশদ্রোহের অভিযোগ রয়েছে। এদেশে কোনো সংস্কার অথবা উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হলেই এদের কাজ হলো বিদেশি ফান্ডের সহায়তায় রাস্তায় নেমে আন্দোলন করা। যদিও বর্তমানে কেন্দ্র সরকারের কঠোর জিরো টলারেন্স নিয়ম-নীতির কারণে এদের প্রভাব এখন অনেকটাই স্তিমিত। বিচ্ছিন্নতাবাদ যেকোনো দেশের একতা, অখণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক, উন্নয়নের পক্ষে অন্তরায়।

তাই শুধু সরকার নয়, বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রতিরোধে চাই রাষ্ট্রীয়, জাতীয়তাবাদী জনসচেতনতা, তবেই এই ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলি ধীরে ধীরে সামাজিক আস্তাকুঁড়ে বিলীন হয়ে যাবে। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে বৈভবশালী ভারতবর্ষ। □

বাংলাদেশে নির্বাচন মানেই সংখ্যালঘু নির্যাতন, হামলা

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে নির্বাচন মানেই ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, হামলা, লুটপাট, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও নির্বিচারে নারী ধর্ষণ। হত্যা। জায়গা-জমি দখল। দেশ থেকে বিতাড়ন। সাম্প্রদায়িক হামলা, নির্যাতন বাংলাদেশে নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হলেও নির্বাচন এলেই তা জাতীয় সংসদই হোক আর স্থানীয় নির্বাচনই হোক, ব্যাপক রূপ নেয়। তাই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের আগে ও পরে তাদের নিরাপত্তায় অন্তত এক মাস সেনাবাহিনী ও বিশেষায়িত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা হয়েছে। সারাদেশের পূজা সংগঠনসমূহের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ গত ৬ ডিসেম্বর এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে বলেছে, যে কোনো দেশে নির্বাচন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। নির্বাচন মানে উজ্জীবন, উদ্‌যাপন। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বেদনার, একই সঙ্গে উদ্বেগ ও শঙ্কার। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ২০০৮ সালের নির্বাচন (এই নির্বাচন হয়েছিল সেনাবাহিনী সমর্থিত এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে)। এছাড়া স্বাধীনতার পর থেকে প্রত্যেকটি নির্বাচনে, নির্বাচনের আগে ও পরে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনও অন্তর্ভুক্ত। সব নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সম্প্রদায়গত ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রচারণার হাতিয়ার হয়ে রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনা করেছে। নির্বাচনে পরাজিত দল হামলা, নির্যাতন করে, কিন্তু আমরা এও দেখেছি, বিজয়ী দলও হামলা করে। আর নির্বাচনে হামলার মুখ্য শিকার হয় প্রধানত ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা।

আলোচনায় পরিষদ উত্থাপিত মূল প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা, ঘৃণা ও বিদ্বেষকে মুখ্য করে বয়ান প্রকাশ এবং সভা-সমাবেশে, বিশেষ করে ধর্মীয় সমাবেশে বিদ্বেষ ও উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান সংখ্যালঘুদের সবসময় এক শঙ্কার মধ্যে রাখে। সাম্প্রতিক সময়ে তা আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। নির্বাচন এলে তা আরও বেড়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে সংখ্যালঘুদের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, বিশেষ করে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে শঙ্কা ও অনীহা তৈরি করে। এ ব্যাপারে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

এই আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাত্ত্বিক ও লেখক ফরহাদ মহজার, বিশিষ্ট লেখক মহীউদ্দিন আহমেদ, ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সম্পাদক এম এ আজিজ, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও লেখক হাসান হাফিজ, কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হাসান, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোর্শেদ, মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা শামসুল হুদা, নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা মেজর হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি জয়ন্ত কুমার দেব, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মণীন্দ্র কুমার নাথ, জনজাতি নেতা সঞ্জীব দ্রং প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর।

সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানি আমলে দীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা ত্রিশ লক্ষ হুতাত্মাদের একটা বড়ো অংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন ব্যাপকভাবে, যার প্রামাণ্য তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে গবেষণামূলক নানা গ্রন্থে। স্বাধীনতার পর ফিরে এসে লক্ষ লক্ষ পরিবারকে ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন জীবন শুরু করতে হয়। তবু তাঁরা ভেঙে পড়েননি এই প্রত্যাশায় যে, স্বাধীন দেশে সাম্প্রদায়িক বিভেদ অনৈক্য থাকবে না।

'কিন্তু গোড়াতেই তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয় শত্রু সম্পত্তি নিয়ে। ১৯৬৫ সালে এই আইন প্রণয়নের পর তার হিংস্র থাবার শিকার হয় লক্ষ লক্ষ পরিবার, অনেককেই ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে দেশত্যাগ করতে হয়। স্বাধীনতার ঘোষণায় এই মাটির সঙ্গে খাপ খায় না এমন আইনসমূহ বাতিল বলে গণ্য হওয়ার কথা বলা হলেও স্বাধীন দেশে এই আইনটিই অর্পিত সম্পত্তি আইন নামে ফিরে আসে। কালক্রমে এই আইনের হিংস্র থাবা বিস্তৃত হয়। আমাদের আন্দোলনে প্রায় তিন দশক পর

প্রত্যার্পণের সিদ্ধান্ত হলেও সরকারের এক অংশের অনীহায় পথটি প্রায় রুদ্ধ করে দিয়েছে।'

'স্বাধীনতার ঠিক পরের বছর ১৯৭২ সালে শারদীয়া দুর্গাপূজায় বেশ কয়েকটি জেলায় হামলা চালানো হয়, যে ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ১৯৭২ সালে হামলাকারীদের সাজা হয়নি। এছাড়া পাঁচ দশক ধরে চলেছে হামলা, নির্যাতন, বাড়ি-ঘর-মন্দির দখল, ধর্মান্তরণ, ঘৃণা উদ্রেককারী প্রচার। সাম্প্রতিককালে যুক্ত হয়েছে ধর্ম অবমাননার কথিত অভিযোগ তুলে হামলা, অগ্নিসংযোগ। পাড়ার পর পাড়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার ঘটনা। কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিচারহীনতার সংস্কৃতি আজও অব্যাহত। আশির দশকে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম যুক্ত হওয়ার আরও এক অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়। অস্তিত্ব সংকটের কথা বলেছি এ কারণে যে, ১৯৪৭ সালে প্রায় ৩০ শতাংশ থেকে সংখ্যালঘুদের হার নেমে এসেছে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৯ শতাংশে। ১৯৭০ সালে এই হার ছিল প্রায় ১৯.৬ শতাংশ। জনজাতিরা, যাঁরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নামে এখন পরিচিতি পাচ্ছেন, ১৯৪১ সালে পার্বত্য অঞ্চলে ছিলেন ৯৫ শতাংশ। ১৯৭৪ সালে এই হার দাঁড়ায় ৮১ শতাংশ। ২০০১ সালে হার নেমে আসে ৪৯ শতাংশে। ২০২২ সালে ৫০ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়। গবেষকরা বলেছেন, ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে।'

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে আমরা হতাশ হয়েছি। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হয়েছে, বাড়িঘরে লুটপাটের পর অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হয়েছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাট হয়েছে। জায়গা-জমি জবরদখল হয়েছে, ধর্ম অবমাননার কথিত অভিযোগে হামলার ব্যাপকতা ও হিংস্রতা বেড়েছে। মানবাধিকার সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনোরিটিজ' গত ১ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই এগারো মাসে ধর্ম অবমাননার ৭৩টি ঘটনার শিকার হয়েছে সংখ্যালঘু সমাজের মানুষ। লাগামহীন মামলা ও গ্রেপ্তার হয়েছে ভিত্তিহীন অভিযোগে। এখন চাঁদাবাজির ঘটনা অতীতের সমস্ত হিসেব পালটে দিয়েছে। ফ্যাসিস্টের (আওয়ামি লিগ) দোসর তকমা লাগিয়ে অজুহাত দাঁড় করা হচ্ছে। সংখ্যালঘুরা আজ এক অসহায় অবস্থার সম্মুখীন। কোথাও কোথাও দেশত্যাগ করার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সরকারিভাবে ঘটনাগুলিকে রাজনৈতিক কিংবা গুরুত্বহীনভাবে দেখানো হচ্ছে।

অন্যদিকে আরেক ভয়াবহ চিত্র হচ্ছে, দীর্ঘ সময় ধরে প্রশাসনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ ছিল। কিন্তু গত ১৪ মাসে শীর্ষ থেকে মাঝারি পর্যায়ে, গুরুত্বপূর্ণ সব অবস্থান থেকে এবং নিম্ন পর্যায়েও সংখ্যালঘুদের চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে কিংবা অবসরে পাঠানো হয়েছে অথবা ওএসডি করে রাখা হয়েছে। পুলিশেও একই অবস্থা, প্রশিক্ষণরত অবস্থা থেকেও ছাড় দেওয়া হয়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'মব' তৈরি করে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু শিক্ষকদের ব্যাপকভাবে অপসারণ করা হয়েছে। কী তাঁদের অপরাধ আমরা জানি না। যারা এখনো প্রশাসনে কাজ করছেন কিংবা পুলিশে আছেন তাঁরাও আতঙ্কে আছেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, গণঅভ্যুত্থানের পর সংস্কারের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করা হয়। নানা কমিশন গঠন করা হয়। মোট এগারোটি কমিশনের কথা আমরা জানি। কিন্তু এই কমিশনগুলিতে সংখ্যালঘুদের স্থান হয়নি। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে, সংবিধান-সহ গুরুত্বপূর্ণ সব কমিশনে অংশীদারদের কথা শোনা হয়েছে। কিন্তু প্রায় আড়াই কোটি সংখ্যালঘু যারা শিক্ষা-দীক্ষা, উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও গবেষণা, সাহিত্য- সংস্কৃতি— এক কথায় দেশ গঠনে যুগ যুগ ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন, তারা অংশীদার হতে পারেননি। তাঁদের কথাই শোনা হয়নি।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ বলেছে, স্বাধীনতার পর থেকে সব কটি জাতীয় সংসদের দিকে দৃষ্টিপাত ও পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব যা থাকা উচিত তা কখনো ছিল না। অথচ পঞ্চাশের দশকের কথা স্মরণ করলে স্বীকার করতেই হবে যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ধারাকে প্রকৃত অর্থে অর্থবহ ও অসাম্প্রদায়িক রূপ দিতে হিন্দু সমাজ বিরাট ত্যাগ স্বীকার করে। ১৯৫৪ সালে পৃথক নির্বাচন প্রথায় প্রাদেশিক পরিষদের ৩০৯ আসনের মধ্যে সংখ্যালঘুরা পেয়েছিলেন ৭২ আসন। পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘুরাই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বার্থে যুক্ত নির্বাচন গ্রহণ করেন। অথচ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলি দলীয় সাংগঠনিক অবস্থানে সংখ্যালঘুদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে না, অন্যদিকে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায়ও তেমন কোনো অবস্থান থাকে না। প্রথম থেকে দ্বাদশ সংসদ পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একবার মাত্র সংসদে নারী আসন-সহ ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব সর্বোচ্চ ২২-এ পৌঁছেছিল। অধিকাংশ সংসদে এই সংখ্যা দশ পেরোয়নি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এখন পর্যন্ত যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

গত ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জুড়ে বেশ কয়েকটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা-সহ বিভিন্ন শহরে ব্যাপক হিংসা শুরু হয়। হিংসাত্মক কার্যকলাপে অংশ নেওয়া জেহাদিরা 'প্রথম আলো' ও 'ডেইলি স্টার'-এর কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে। এরপর সেই স্থানে সেনা মোতায়েন করা হয় এবং আটকে পড়া সাংবাদিকদের উদ্ধার করা হয়। অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় শোক ঘোষণা করে এবং এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু হয়। সন্দেহভাজনদের ছবি প্রকাশ করে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে ময়মনসিংহের ভালুকায় ইসলাম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে একদল উত্তেজিত ও হিংস্র জেহাদির হাতে নৃশংসভাবে হত্যার শিকার হন দীপু চন্দ্র দাস।

এদিন রাত ৯টার সময় পাইওনিয়ার নিট কম্পোজিট কারখানা এলাকায় তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় এবং তাঁর মৃতদেহ গাছে বেঁধে আগুন দেওয়া হয়। তারাকান্দা উপজেলার বাসিন্দা রবি চন্দ্র দাসের পুত্র দীপু ছিলেন স্থানীয় গার্মেন্টস্ কারখানার শ্রমিক। অর্ধদগ্ধ মৃতদেহটিকে পুলিশ মর্গে পাঠায় এবং তদন্ত শুরু করে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর। এছাড়াও বাংলাদেশে তছনছ হয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র— 'ছায়ানট'। জেহাদিদের আক্রমণের ফলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বই, নথিপত্র, বাদ্যযন্ত্র ও শিল্পকর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেটে ফেলা হয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছবিও। জেহাদিদের মিছিল থেকে ঘন ঘন ওঠে ভারতবিরোধী স্লোগান। চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনার ভারতীয় দূতাবাস ও ভিসা কেন্দ্র আপাতত বন্ধ।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজনৈতিক পরিবর্তনের আশায় দিন গুনছেন

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

ইতিমধ্যেই অঙ্গ ও কলিঙ্গের রাশ চলে এসেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র হাতে। বাকি রয়েছে বঙ্গ। এই ভোট হওয়ার কথা আগামী নতুন বছরের মার্চ-এপ্রিলে। ভুয়ো ও মৃত ভোটারদের ঝাড়াই করতে 'শুদ্ধীকরণ' করা হচ্ছে ভোটার তালিকায়, যার পোশাকি নাম এসআইআর। মানুষের দাবি, ঠিকমতো এসআইআর করা হলে এবং ভোট-পর্ব নির্বিঘ্নে হলে এবার পশ্চিমবঙ্গে উলটে যাবে পাশার দান। গদি খুইয়ে কার্যত পথে বসবে তৃণমূল। আর এতদিন যাঁরা পথে পথে ঘুরে ঘাম ঝরিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পদ্ম ফোটাতে মাথার ঘাম ফেলেছেন পায়ে, তাঁরা বসবেন শাসন ক্ষমতায়। প্রত্যাশিতভাবেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে যারা কার্যত লুট করেছে জনগণের টাকা, বঞ্চিত করতে ছাড়েনি সমাজের প্রান্তিক মানুষটিকেও, তাদের পোরা হবে গারদে। অবশ্য ইতিমধ্যেই শাসক দলের অনেকে কাটিয়ে এসেছেন জীবনের মূল্যবান বেশ কয়েকটা বছর।

সেই কারণেই ২০২৬ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন শাসক এবং বিরোধী উভয় দলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। শাসকের কাছে যেমন এই নির্বাচন ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই, তেমনি বিজেপির কাছে তৃণমূলকে ভাগিয়ে নবান্ন দখলের লড়াই। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এবার রাজ্যের হাওয়া পরিবর্তনের পক্ষে অনুকূল। এর প্রথম কারণ যেমন প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, তেমনি আর একটি কারণ হলো শাসক দলের বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অভিযোগ। এর মধ্যে যেমন রয়েছে আরজি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসকের রহস্যজনক মৃত্যু, তেমনি হাতে গরম বিষয় হলো ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি 'ভোগে' যাওয়া। আদালতের নির্দেশে এঁদের চাকরির প্যানেল বাতিল হয়েছে। নতুন করে ফের পরীক্ষা নিতে বলা হয়েছিল। অবশ্য রাজ্য সরকার যদি দাগি শিক্ষকদের (যারা টাকা দিয়ে কিংবা কোনো নেতার ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুপারিশে চাকরি পেয়েছিলেন) তালিকা আদালতে জমা দিত, তাহলে হয়তো ফের পরীক্ষায় বসতে হতো না যোগ্য শিক্ষকদের। রাজ্যের স্কুল সার্ভিস অবশ্য আদালতে একটা তালিকা জমা দিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে দাগির সংখ্যা মেরে কেটে দু' হাজার। আদালত জানিয়ে দেয়, এদের বাদ দিয়ে ফের বাকিদের পরীক্ষা নিতে হবে। নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোট খোয়ানোর ভয়ে তড়িঘড়ি পরীক্ষা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে রাজ্য সরকার। কারণ তাদের হিসেব স্পষ্ট। ২৬ হাজার শিক্ষকের পরিবারে গড়ে যদি ৪ জন করেও ভোটার থাকেন, তাহলে সেই যে বিপুল সংখ্যক ভোট, তার প্রায় ৯০ শতাংশই বিরোধীদের বাক্সে পড়বে। এই সব সাত-পাঁচ ভেবে তড়িঘড়ি বিজ্ঞপ্তি জারি করে পরীক্ষাও নিয়ে নেয় এসএসসি কর্তৃপক্ষ। সেই পরীক্ষায় দাগিদের অনেকেই অংশ নিয়েছে বলে অভিযোগ। যার জেরে ফের খারিজ হতে পারে এই পরীক্ষার প্যানেলও। তবে অবশ্যই শেষ কথা বলবে আদালত। কারণ বিষয়টি বিচারাধীন।

প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, পার্ট-টাইম শিক্ষক দিয়ে। পুলিশের ক্ষেত্রেও তাই। কাজ চলছে সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে। এটাই এখনকার রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা।

এসব বিতর্কিত বিষয়ের পাশাপাশি রয়েছে বালি চুরিকাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলের জেল, চাকরি চুরিকাণ্ডে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জেল এবং সর্বোপরি, রেশনের চাল চুরির অভিযোগে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জেল-জীবনযাপন। এসবই তৃণমূলের গায়ে লেগে রয়েছে দগদগে ঘায়ের মতো। এসব থেকে রাজ্যবাসীর দৃষ্টি ঘোরাতেই তৃণমূল নেত্রী স্বয়ং পথে নেমে পড়েছেন এসআইআরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে। এসআইআরের জুজু দেখিয়ে তিনি চেয়েছিলেন মুসলমান ভোটব্যাংক অটুট রাখতে। তবে তাঁর সে কৌশল খাটেনি। কারণ এ রাজ্যের শিক্ষিত মুসলমানেরা বুঝে গিয়েছেন, শাসক দল তাঁদের ব্যবহার করছে দাবার বোড়ের মতো। যে কৌশল মুখ্যমন্ত্রী শিখেছিলেন বাম ও কংগ্রেসের কাছ থেকে, সেই কৌশলই হতে পারে ব্যুমেরাং। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এবার আর তৃণমূল সুপ্রিমোর সেই মিথ্যাচার-বাণ কাজে লাগবে না। কারণ একদিকে যেমন মানুষ সচেতন হয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর 'ধড়িবাজি'র বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন রাষ্ট্রবাদী মুসলমানেরা। সব মিলিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচন শাসক দলের পক্ষে আক্ষরিক অর্থেই হতে চলেছে অ্যাসিড টেস্ট।

এখানেই উঠছে, সেই মোক্ষম প্রশ্ন। ফের কি তৃণমূল সুপ্রিমো বসবেন নবান্নের চোদ্দতলার ঠাণ্ডা ঘরে, নাকি নীলবাড়ির মোহ কাটিয়ে তাঁকে ফিরতে হবে কালীঘাটের টালির চালার বাড়িতে? (নিন্দুকরা অবশ্য বলেন, নামেই টালির চালার বাড়ি, অন্দরসজ্জা টেক্কা দেবে রাজ্যের যে কোনো ধনী ব্যক্তির বাড়ির অন্দরমহলকে।)

মানুষের দাবি, এবার বিজেপি লিফট্ বেয়ে দখল নেবে নবান্নের চোদ্দতলার। আর শাসকদলের দাবি, দিবাস্বপ্নই দেখতে থাকুক বিজেপি। গদি ধরে রাখতে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের যতই অক্সিজেন জোগান তৃণমূল সুপ্রিমো, তারা কিন্তু সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। কারণ, এবার সত্যি সত্যিই খেলা হবে।

এরাজ্যে বিধানসভার মোট আসন ২৯৫টি। ক্ষমতায় আসতে গেলে বিজেপিকে পেতে হবে অন্তত ১৪৮টি আসন। উনিশের লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ১৮টিতে জয়লাভ করে বিজেপি। সেবার বিজেপি ভোট পেয়েছিল ৪০.৬ শতাংশ। ১২১টি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে ছিল তারা।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে অবশ্য বিজেপির ভোট কমে হয় ৩৮.৫ শতাংশ। এই নির্বাচনে তৃণমূল পায় ৪৮.৫ শতাংশ ভোট। ফলে ৭৭টির বেশি আসনে জিততে পারেনি বিজেপি। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন সংখ্যা কমে হয় ১২। সেবার তারা এগিয়ে ছিল ৯১টি বিধানসভা কেন্দ্রে। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়জয়কার দেখে নৈতিকতার পাশাপাশি জনাদেশ বিসর্জন দিয়ে অনেক হাওয়া-মোরগ ভিড়ে গিয়েছিলেন শাসক দলে। তার জেরে বিধানসভায় বিজেপির প্রতিনিধির সংখ্যা কমে গিয়ে হয়েছে ৬৫। এই সংখ্যাকে ১৪৮-এর ম্যাজিক ফিগারে পরিণত করা আপাতদৃষ্টিতে কঠিন মনে হলেও, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এবার ক্ষমতায় আসছে বিজেপিই।

উত্তরবঙ্গ হলো বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। এখানে ৫৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের অধিকাংশেই ফুটতে চলেছে পদ্ম। যেগুলিতে বিজেপি প্রার্থীদের জয়লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে সেই আসনগুলি হলো কোচবিহারের মাথাভাঙা, কোচবিহার উত্তর, নাটাবাড়ি ও তুফানগঞ্জ, আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার,ফালাকাটা এবং মাদারিহাট, জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ও ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি, দার্জিলিঙের কার্শিয়াং, দার্জিলিং, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া ও শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট, তপন ও গঙ্গারামপুর, মালদার হবিবপুর, গাজোল, মালাদা ও ইংলিশবাজার। এই সব আসনে উনিশ, একুশ এবং চব্বিশ— এই তিন নির্বাচনেই বিজেপির ভালো ফল চোখে পড়ার মতো। দক্ষিণবঙ্গের এমন আসনগুলির মধ্যে রয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্র, এছাড়াও, নদীয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনার বেশ কিছু আসনও রয়েছে। এর মধ্যে নদীয়ার কৃষ্ণনগর উত্তর এবং উত্তর ২৪ পরগনা শিল্পাঞ্চলের ভাটপাড়া বাদে বাকি কেন্দ্রগুলিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বস্তুত, এ রাজ্যের অন্তত ৭০টি কেন্দ্রে জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেন এই মতুয়া ভোটাররা। এক সময় এই মতুয়া ভোটারদের আশীর্বাদেই পুষ্ট হয়েছিল বামেরা।

পালাবদলের পর মতুয়া হাওয়া ঘুরে যায় তৃণমূলের দিকে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এবার সেই হাওয়ার অনেকখানিই লাগবে বিজেপির পালে। এরকম কয়েকটি আসন হলো, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ, চাকদহ, কল্যাণী, হরিণঘাটা, বাগদা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ ও গাইঘাটা। বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সীমান্তবর্তী হুগলির খানাকুল, গোঘাট ও পুরশুড়ায়ও পদ্ম ফোটার সমূহ সম্ভাবনা। পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর সদর, পুরুলিয়ার পুরুলিয়া সদর ও পারা, বাঁকুড়ার ওন্দা, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, কোতুলপুর ও সোনামুখীতেও বিজেপির সংগঠন শক্ত। পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর, আসানসোল দক্ষিণ ও কুলটিও বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাপুটে রাজনীতির কারণে পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূলের দাঁত ফোটানো এক প্রকার অসম্ভব। একুশ ও চব্বিশ সালের নির্বাচনে ময়না, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম (এখানেই গত বিধানসভা নির্বাচনে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে হাজার দুয়েক ভোটে হারিয়ে দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী রাতারাতি বনে গিয়েছিলেন জায়ান্ট কিলার), কাঁথি উত্তর, কাঁথি দক্ষিণ, ভগবানপুর ও খেজুরিতেও বিজেপি ভালো ফল করবে বলেই আশা রাজনৈতিক মহলের।

বিজেপি নেতৃত্বের একটি অংশের অনুমান, সব মিলিয়ে এই ১০৬টি আসনেই দলের জেতার ব্যাপক সম্ভাবনা। বিজেপির পাখির চোখ ২০১৯-এর ভোটে এগিয়ে থাকা ৩৫ আসনও। এর মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির মাল, কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ কেন্দ্র। এই তালিকায়ই রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমানের বরাবনি, আসানসোল, জামুড়িয়া, রানিগঞ্জ, দুর্গাপুর ও পাণ্ডবেশ্বর। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা, নারায়ণগড়, দাঁতন ও কেশিয়াড়িতেও পদ্ম ফোটার সম্ভাবনা ক্রমেই উজ্জ্বল হচ্ছে। বীরভূমের রামপুরহাট, ময়ূরেশ্বর, সাঁইথিয়া ও সিউড়ি, ঝাড়গ্রামের গড় বেতা, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও ঝাড়গ্রাম; বাঁকুড়ার তালডাংরা, রানিবাঁধ ও রায়পুরেও এবার বিজেপির উজ্জ্বল উপস্থিতি। হুগলির পাণ্ডুয়া, সিঙ্গুর ও শ্রীরামপুর, পূর্ব বর্ধমানের গলসি ও কাটোয়া, উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাট-গোপালপুর, ব্যারাকপুর, জগদ্দল, নৈহাটি ও বীজপুর, কলকাতার রাসবিহারী এবং পুরুলিয়ার বান্দোয়ানেও বিজেপি প্রার্থী জয় প্রায় নিশ্চিত বলেই দাবি স্থানীয় মানুষের। রাজনীতির কারবারিদের মতে, কলকাতা ও তার আশপাশের শহুরে এলাকায় তৃণমূল সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, কর্মসংস্থানের বেহাল দশা এবং তুষ্টীকরণের রাজনীতিতে যারপরনাই ক্ষুব্ধ শিক্ষিত ভোটাররা। তার জেরে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকাগুলির বেশ কিছু এগিয়ে না থাকা আসনেও তৃণমূলকে মাত দিতে পারে বিজেপি।

নতুন ভোটারদের একটা বড়ো অংশের ভোটও এবার পড়বে বিজেপির ঝুলিতে। কারণ শিক্ষিত ভোটারদের এই অংশ ভালোই বুঝে গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে আর যাই হোক চাকরি হবে না। এর একটি কারণ যদি হয় রাজ্যের হতশিল্প দশা, তবে অবশ্যই আর একটি কারণ হলো সরকারি চাকরির বেহাল দশা। প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, পার্ট-টাইম শিক্ষক দিয়ে। পুলিশের ক্ষেত্রেও তাই। কাজ চলছে সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে। এসব দেখেশুনে এই প্রজন্ম ভালোই বুঝে গিয়েছে, এভাবে মাথা বিকিয়ে নিজের রাজ্যে চাকরি করার চেয়ে বিজেপি-শাসিত রাজ্যে গিয়ে মাথা উঁচু করে চাকরি করা গৌরবের। তাই এঁদের ভোটেও ভরতে পারে বিজেপির ঝুলি। সব মিলিয়ে এবার বোধহয় রাহুর গ্রাসে পড়তে চলেছে তৃণমূল। □

সনাতনী সৌকর্যে বোল্ড আউট ডিসেম্বর-জানুয়ারির ঔপনিবেশিক দিনক্ষণ

শীর্ষ আচার্য ও ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

'ত্যাগব্রতী-সন্ধ্যা' বলতে বুঝি ক্রিসমাস ইভের দিন, কারণ ১৮৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় হুগলির আঁটপুর গ্রামে বাবুরাম মহারাজের বাড়িতে ধুনি জ্বালিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য যুবক শিষ্যরা ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ঐশীকাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ দত্ত। দিনটি 'ধুনি দিবস' নামেও পরিচিত। আবার ১৮৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে পৌঁছে অখণ্ড ভারতের সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ইদানীং একবিংশ শতাব্দীতে ২৫ ডিসেম্বর সনাতনী ধর্মসংস্কৃতির মানুষজন তুলসীপূজন করে, এই মাসেই লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ করে সৌকর্যে-মাহাত্ম্যে হিন্দুয়ানি প্রোথিত করে দিচ্ছেন সনাতনীদের ভুলে যাওয়া মনে,। খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের পাতায় বয়ে চলেছে হিন্দু সংস্কৃতির স্রোত। থামছেই না। এ এক অপ্রতিরোধ্য প্রবাহ, স্বতঃস্ফূর্ত হিন্দুত্ব। আর এতেই বোল্ড আউট ২৫ ডিসেম্বরের ক্যালেন্ডারি-পার্বণ, পয়লা জানুয়ারি। হিন্দুজন আপন সৌকর্যে বিনা রক্তপাতে জয় করে নিয়েছে কলোনিয়াল কালচার।

২৫ ডিসেম্বর তুলসীপূজন পালিত হচ্ছে। অনেকে বলেন, তা নাকি কোনো এক ধর্মগুরু শুরু করিয়েছেন। তা হয়তো মিথ্যা নয়, আবার পুরোটা সত্যিও নয়। আগে থেকেই হিন্দুসমাজ আপন সৌকর্যে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে নানান ধর্মীয় কৃত্য বহুদিন ধরেই করে থাকে। মূল আয়োজন ভাগবত ও গীতাপাঠ, পুরাণের কথকতা, নানান ধর্মগুরুদের জীবন ও বাণীর আলোচনা। সব আয়োজনেই একটি তুলসীমঞ্চের অবস্থান লক্ষ্য করা যেত, থাকতো নিকোনো উঠোন এবং আলপনায় দিয়ে তার মনোরম সাজসজ্জা। সবারই মূল দৃষ্টি তুলসীতলার প্রদীপ প্রজ্বলনে। ভক্তবৃন্দ সেই উপলক্ষ্যে সমাজের কাছে তুলসীগাছ চেয়ে নিতেন, চলতো উদ্ভিদ পরিচর্যা এবং আপন গৃহে তুলসীমঞ্চে আনুষ্ঠানিক রোপণ। যাদের গৃহে আগেই রোপিত হয়েছে তুলসীগাছ, সে গাছে ডিসেম্বরে মঞ্জরী আসে। বিভিন্ন মঠ-মিশন, হরিসভাগুলিতে ডিসেম্বরের ২০ থেকে ৩১-এর মধ্যে ইংরেজি নববর্ষের প্রাক্কালে নানান কথকথার আয়োজন করা হয়।

ফঃ ৩

ধর্মসভায়, সংকীর্তনে তুলসী মাহাত্ম্যের অপূর্ব পরিবেশ গড়ে ওঠে। শীতের বিকেল থেকে সন্ধ্যায় জমজমাট ধর্মসংস্কৃতির বাতাবরণ। এরই সঙ্গে জুড়ে গেল ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি, কল্পতরু দিবস। খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনটিও হলো বোল্ড আউট। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কল্পতরু দিবস হিসেবে ১ জানুয়ারিই-বা বেছে নিলেন কেন?

তুলসী একটি অতি পবিত্র এবং অত্যন্ত উপকারী উদ্ভিদ। হিন্দুরা চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্যন্ত টানা একমাস তুলসীমঞ্চতে তুলসীধারার ব্যবস্থা করেন ঘরে ঘরে। মাটির হাঁড়িতে তলায় ছোটো একটি ফুটো করা হয়, তাতে পলতের কাপড় প্রবেশ করানো। হাঁড়ির জলে অতি ধীর ধারায় তুলসী-সেচের বন্দোবস্ত করা হয়। কৃষিবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে 'বিন্দুপাতি সেচ' বা Drip Irrigation বলা হয়। তুলসীর মতো জীবনদায়ী এক মহার্ঘ ভেষজ, অন্তিমকালে ইহজীবনের মায়াজাল থেকে মুক্তির এক মহৌষধি হয়ে উঠবে, লোকায়তিক দর্শন ছিল এটাই তুলসী আধ্যাত্মিক দুনিয়া দখল করে বসেছে তার বহু প্রাচীনকাল থেকে। তুলসীপূজন কোনো অর্বাচীন কৃত্য নয়, হাজার হাজার বছরের উত্তরাধিকার। সংসবৎসরই নানান শুভকাজের আসরে তুলসীপূজা ও পরিক্রমা চলে। তবে ডিসেম্বর মাসেই তা কেন প্রচার লাভ করলো তার কিছু কারণ রয়েছে।

১. শীতপ্রধান দেশে, অঞ্চলে এবং ডিসেম্বরের শীত-মরশুমে তুলসীগাছকে পত্রপল্লবে এবং সপুষ্পে রক্ষা করা বেশ সমস্যা। তাই এই সময় পূজার অন্তরালে তুলসীগাছকে যত্নআত্তি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

২. কৃত্রিম 'ট্রি' বানিয়ে ফেস্টিভ্যালের বদলে সজীব ও মূল্যবান ভেষজ উদ্ভিদকে সাজিয়ে, পবিত্রতায়, কৃতজ্ঞতায় তার পূজা করা যেন অনেক বেশি বাস্তব এবং যুক্তিসম্মত।

৩. বর্ষাকালের শেষ মরশুমে তুলসীমঞ্জরীর বীজ আপনাআপনি মাটিতে পড়ে কিংবা কেয়ারিতে বীজ ফেলে নতুন চারা তৈরি হয়। তুলসীমঞ্চে, মাটির টবে সেই চারা রোপণ করলে ধীরে ধীরে তা শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে বেড়ে যায়। তুলসীমঞ্চ নান্দনিক হয়ে ওঠে। এসময়

তুলসীপূজনের মধ্যে আরাধ্য উদ্ভিদের একটি সম্পূর্ণ সৌধ বা Plant architecture নির্মিত হয়। ডিসেম্বরে ঝলমলে আলোয়, কৃষিকর্ম শেষ হয়ে আসা উদ্ভিদপূজনের আবহে ধর্মীয় অঙ্গনমঞ্চে গাছের এক শ্রীময়ী রূপ প্রকাশিত হয়। গাছের শীর্ষে শীর্ষে পুষ্পমঞ্জুরী, শাখায় শাখায় কাঁচাপাকা বীজ। ফুলে-ফলে-পল্লবে অপরূপ সৌন্দর্য, পূজনে-আরধনায় যেন পৃথক প্রেরণা জোগায়।

ইদানীং বহু হিন্দু সংগঠন, এমনকী পরিবেশবান্ধব সংগঠনগুলিও তুলসীপূজন দিবস পালন করে ২৫ ডিসেম্বর ভক্তমণ্ডলীর হাতে তুলসীগাছ তুলে দিচ্ছেন। হসিসভাগুলিতে সাজানো হচ্ছে তুলসীমঞ্চ। অতিথি বরণ করা হয় ফুলের বদলে সুদৃশ্য পাত্রে রোপিত তুলসীগাছ দিয়ে। তুলসী একটি ভেষজ গাছও বটে। শীতকালের ঠাণ্ডা আবহাওয়া দুটো তুলসীপাতা চিবিয়ে খেলে ফুসফুসের আরাম কার না হয়। সর্দিকাশির সমস্যার সমাধান করতে তুলসীর জুড়ি নেই। অনেকে তুলসীপাতা বেটে ছোটো ছোটো গুলি বা বনবটি তৈরি করে রোদে শুকিয়ে কাঁচের ছোটো পাত্রে ভরে নেন। এই বটিগুলি দৈনিক সেবনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ এবং পুরো জানুয়ারি মাস জুড়েই তুলসী ঘনবটি সেবন এক লোকায়তিক ভেষজের সুচিকিৎসা। একটি ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদ দেশীয় ভেষজের গুণে এবং আধ্যাত্মিক পরশে হয়ে উঠছে দেবোপম। তুলসীপূজন এমনি নীরব হিন্দুয়ানির অভ্যুত্থান, যার আবেদন তুলনাহীন। এটি কোনো ধর্মগুরুর নিদানতত্ত্ব নয়, এটি ভারতবর্ষের চিরকালীন পার্বণ। শীতের মরশুমে বৃদ্ধ মানুষ কফ তুলে হাঁপানির টান থেকে রেহাই পেতে তুলসীপূজনের পর তুলসীসেবন করেন। ধর্মীয় মোড়কে এক দারুণ লোকৌষধকে ব্যবহার তো পূজারই অন্য নাম। তুলসীর মতো এমন অনবদ্য উদ্ভিদ হিন্দুধর্ম ছাড়া আর কোনো ধর্ম-সংস্কৃতিতে আছে?

'দেশের মাটি' তুলসী-নৈকট্য যোজনা :

'দেশের মাটি' এবং পরবর্তী সময়ে 'দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির' নামে এরকটি সংগঠন দীর্ঘ এক দশক ধরে মানুষের সঙ্গে কাজ করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সাধ্যমতো নানান কাজ করে এসেছে। বিগত কয়েক বছর 'তুলসীপূজন' এবং তুলসী মাহাত্ম্য প্রচারও এই সংগঠন করেছে। ২০২৫ সালে 'তুলসীপূজন কার্যক্রম' একটি পরিকল্পিত ধারায় করেছে এই সংগঠন। একটি বিশেষ দিনে তা সীমাবদ্ধ না রেখে বছরব্যাপী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বর্ষায় অসংখ্য তুলসীর চারা প্রস্তুত করে অথবা করিয়ে, কার্যকারীভাবে তা বিতরণ করিয়ে, গ্রাম-শহর-নগরে তুলসীমঞ্চে স্থাপন করিয়ে পরস্পরিক পারমার্থিক ও হৃদ্য সম্পর্ক নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে 'দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির'। উদ্দেশ্য 'তুলসী' নামক অতুল্য এক ভেষজ উদ্ভিদের লৌকিক ব্যবহার এবং তুলসীপূজনের মাধ্যমে ধন্যবাদাত্মক কার্যক্রম। নানান দৈহিক সমস্যায় তুলসী-সহ নানান ভেষজ উদ্ভিদের মিশ্র ব্যবহার উপকারী বলে আজও চিহ্নিত। 'দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির' নানান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের মাধ্যমে নিবিড় ও ব্যাপকভাবে এই কাজটি সম্পন্ন করছে এবার। সেই সঙ্গে অনুরোধ করেছে, দেশবাসী যেন নিজ নিজ অঞ্চলে প্রতিবেশীদের উঠোনে, তুলসী মঞ্চের পাশে জন্মানো ছোটো চারা ছিদ্রযুক্ত ছোটো পলিব্যাগে মাটিভর্তি করে স্থানান্তযোগ্য উপযোগী চারায় রূপান্তর করে তা নিকটস্থ পরিকল্পিত স্থান/মঠে-মন্দিরে পাঠান এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে তা বিতরণ করেন। গাছ যারা পাবেন, তাদের স্নেহে, যত্নে ও লালনপালনে বড়ো হয়ে উঠবে, আর অসংখ্য চারার জন্ম দেবে। তুলসনীর পাকা বীজ সংগ্রহ করে, কেয়ারিতে যত্ন করে চারা বানানো যায়। এই চারা পরবর্তীকালে নানান সংগঠনের মাধ্যমে সংগ্রহ ও বিতরণ করার কথা বলা হয়েছে দিবসের লক্ষ্য হচ্ছে সামগ্রিক ও সমন্বিত ভাবে রাজ্য জুড়ে সকল সংগঠনের সমবেত প্রচেষ্টায় বিপুল পরিমাণে তুলসীর চারা ২০২৫ সালে বিতরণ ও রোপণের কর্মসূচি। 'দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির' এই কাজটির সূচনা করলেও, তা তাদের একলার কাজ নয়। সকলের প্রচেষ্টায় কাজটি সুসম্পন্ন হওয়া উচিত। ২৫ ডিসেম্বর সবাইকে সর্বত্র, আপন আপন গৃহে অথবা সম্মিলিতভাবে আনুষ্ঠানিকতা-সহ তুলসীপূজনের আহ্বান জানিয়েছে 'দেশের মাটি'।

তুলসীপূজন মানে কেবল তুলসী মাহাত্ম্য নয়; তুলসীর উপকারিতা, ভেষজ হিসেবে তার অতুলনীয়তা, গৃহ পরিবেশে তার নান্দনিকতা, সনাতনী সংস্কৃতির বার্তাবহ এই তুলসীপূজন। উঠোন/মঞ্চ পরিষ্কার করে, গাছের যত্ন নেওয়া, সামান্য বাতাস/নকুনদানা/কদমা নৈবেদ্য দিয়ে আপন সৌকর্যে অথবা পৌরোহিত্যের সাহায্যে আরাধনা করা তুলসীমাতাকে। তুলসীপূজনের ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা। এ একটি হিন্দু জাগরণের কার্যক্রম।

সান্টা-যিশু সাজানো হবে কেন?

চব্বিশে ডিসেম্বর থেকে পয়লা জানুয়ারি হিন্দু-মিলন-মেলার আয়োজনে শিশুদের সান্টা-যিশু কেন সাজাবে? সাজাবো বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, তুলসী মহারানি অথবা কৃষ্ণার্জুন। 'যেমন খুশি সাজো'-তে স্বচ্ছতোয়া সনাতনী সংস্কৃতির স্রোত বয়ে যাক। কয়েক বছর ধরে দেখিছি জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমীতে সনাতনী সমাজের ছোটো ছেলে মেয়েদের যথাক্রমে কৃষ্ণ এবং রাধা সাজিয়েছেন বাবা-মায়েরা; দুর্গাপূজায় দেবী দুর্গা, শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী, বাংলা নববর্ষে মহারাজ শশাঙ্ক। এদিকে তুলসীপূজনে, গীতা-জয়ন্তীর আয়োজনে ডিসেম্বর মাসটি সনাতনী আবহে টইটম্বুর। 'ত্যাগব্রতী-সন্ধ্যা' হচ্ছে ২৪ ডিসেম্বরের দিনটি, ক্রিসমাস ইভ যেদিন পালন করে খ্রিস্টানরা, তাকেই অতিক্রমের চেষ্টা বিনা দ্বন্দ্বে করেছে সনাতনী হিন্দু। ২৫ ডিসেম্বর সনাতনী ধর্মসংস্কৃতির মানুষজন তুলসী পূজন করেন। গীতা জয়ন্তীতে গীতাপাঠ এবং অনুধ্যান করে দিনটির মাহাত্ম্যে হিন্দুয়ানি প্রোথিত হয়েছে সনাতনী সংস্কৃতির স্রোতে।

কলোনিয়াল ফেস্টিভ্যালের দিনগুলিতে মরাগাছে টুনিবাল্ব জ্বালিয়ে কেন সাজাবো? প্রকৃতি ধ্বংস না করে প্রকৃতিবান্ধব হয়ে, বট-অশ্বত্থের তলা নিকিয়ে, পরিষ্কার করে হবে বনভোজনের আয়োজন, যেমন খুশি সাজো, হরিসভাগুলিতে তুলসীর চারা বিতরণের পার্বণ।

ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞানের দায়িত্ব পালন করতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রেপ্লিকাও শিশুসজ্জায় থাকবে— কৃষ্ণার্জুন। সমাজকে সদর্থক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজনে অস্ত্রধারী অর্জুন হতে হবে, আর আমাদের সহায় হবেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। হিন্দু শিশুকে সান্টা-যিশু সাজিয়ে কলোনিয়াল কালচারের হ্যাংওভারে আর কতদিন রাখবো? ফিরতে হবে আপন সংস্কৃতির পথে। □

মৌ চৌধুরী

একান্নবর্তী পরিবার হয়ে উঠুক সমাজ জীবনের ভিত্তি

এই লেখাটা তৈরি করার আগে দু'টো কথা মনে পড়ছে। মান্না দে-র গাওয়া সেই কালজয়ী গান 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই'। আর পরের কথাটা হলো, মোবাইলে ভোরেই 'শুভ সকাল'-এর একটি পোস্ট পেলাম তাতে লেখা 'আমরা সবাই একটি বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি'। একটু মন দিয়ে লেখাটা পড়ে কতশত ভাবনা ঘিরে এলো।

কথাগুলো হয়তো অনেক বারই শোনা তবুও ভাবায়। মূল কথাটা হলো, আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী একান্নবর্তী পরিবারগুলো একটা সময় সমাজের ভিত্তি ছিল। এখন বিভিন্ন কারণে পরিবার টুকরো হয়ে গিয়েছে। এই টুকরো হয়ে যাওয়ার কারণ মূলত ভোক্তাবাদ এমনটাই মত অনেকের। পশ্চিমের দেশগুলো যেগুলিকে একত্রে 'প্রথম বিশ্ব' বলে অভিহিত করা হয় তারা ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক শোষণ করবে বলে ডালপালা মেলে 'তৃতীয় বিশ্ব' বলে পরিচিত দেশগুলোর পরিবারগুলিকে সুচারু ভাবে টার্গেট করেছে। অনেকের অভিমত হলো, এর প্রভাব সবথেকে বেশি পড়েছে ভারতের উপর।

পৃথিবীর মানুষ এখন আধুনিকতার ছোঁয়ায় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজে মরিয়া। বিদেশি ভোক্তাবাদী সংস্থাগুলি মগজ ধোলাই করে সামান্য সুখের মুখ দেখিয়ে অসুখের কারাগারে আবদ্ধ করেছে সমাজকে। সবার কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের দেশের মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় অলীক সোনার হরিণের পেছনে ছুটছে, আরও সহজ করে বলতে হয়, কেন এই বিষপান করছে। ভারতবাসী কী তাদের সেই চিরকালীন শিক্ষা, পরম্পরা, ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়েছে।

এই ভোগের লালসায় ছুটে চলার আরও একটি ভয়াবহ দিক হলো পরিবার থেকে সন্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। সন্তান শিক্ষিত হয়ে অর্থনৈতিক সংস্থান করেই শেকড় ছেড়ে বেরিয়ে যায়। স্বাধীন হয়ে নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে বাঁচতে চায়। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় বিভিন্ন বিদেশি সংস্থাগুলি প্রায় কোনো বিনিয়োগ না করেই ব্যবসা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন অনলাইনে জামা কাপড় থেকে শুরু করে রোজকার সব ধরনের কাঁচা বাজার, ওষুধ এমনকী পূজার ফুল ঘরে বসে মিলছে। ফোনে বুক করলেই গাড়ি বাড়ির সামনে হাজির। এক কথায় অনেক সুবিধা হয়তো আমার ঘরের সামনে হাজির এবং মানতেই হবে অনেক সমস্যার সমাধানও হয়তো হয়েছে কিন্তু 'সুখ' কি বেড়েছে।

এই সংস্থাগুলি, যারা বেশির ভাগ বিদেশ থেকে ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের 'অফারের' দৌলতে কত বেশি টাকা রোজ আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তার কোনো হিসাব নেই। এরপর আছে কিস্তিতে বিভিন্ন জিনিস কেনার সুযোগ। এখন একবার ভেবে দেখা যেতে পারে আখেরে আমরা কতটা লাভবান হচ্ছি। মূলত আমেরিকা, জার্মানি ও চীনের দেখানো ভোগবাদের এই পথে চলতে গিয়ে সুচারু ভাবে একান্নবর্তী পরিবারগুলি টুকরো হচ্ছে। এর পাশাপাশি অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় কর্মসংস্থানের জন্য পরিবার থেকে সদস্যদের বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হওয়া। ভারতের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ টি রাজারমন, ভেঙ্কটেশ বি রাও, কীর্তিমান পাণ্ডে-সহ অনেকেই মনে করেন কর্মসংস্থানের জন্য পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া আর ভোগবাদের লালসার জন্য আলাদা হয়ে যাওয়া দুটো বিষয় ভিন্ন। এখন বহু পরিবারের সন্তান কর্মসংস্থান, লেখাপড়ার বা অন্যান্য কারণে দূরে থাকে কিন্তু তারা মানসিকভাবে পরিবারের সঙ্গেই থাকে। বিভিন্ন সময়ে বাড়ি ফিরে আসাও হয়। কিন্তু একটা বিরাট অংশ যারা প্রধানত নিজে একা থাকব এই মানসিকতা নিয়ে চিরকালের জন্য চলে যায় প্রশ্ন আসে তারা কি সমাজের অবক্ষয়।

এখন থেকে বহু বছর আগে বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, সদ্য স্বাধীন দেশের ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষস্থানীয় দু'চারজন নেতার বহু ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সব মিলিয়ে যাবতীয় প্রভাব ভারতের পরিবারগুলির ওপর এসে পড়েছিল। এই সুযোগটাই নিয়েছিল বিদেশি সংস্থাগুলি। পরিবার টুকরো হচ্ছে; বৃদ্ধাশ্রম, ক্রেশের সংখ্যা বাড়ছে; বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট নির্মাণ হচ্ছে। 'কেবলমাত্র নিজেরটুকু' এই মানসিকতা ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। এবং টেলিভিশনের পর্দায় নিত্যনতুন লোভনীয় বিজ্ঞাপন— সব মিলিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত।

সমাধানহীন এক শূন্যতার ফলশ্রুতি হলো ঘরে ঘরে বয়স্ক মানুষের হাহাকার। সামাজিক বন্ধন, দায়বদ্ধতা, পারিবারিক টান এখন উপেক্ষিত। দেশের পারিবারিক পরম্পরা পায়ে দলে বিদেশের বিশেষ করে আমেরিকার সামাজিক কু-দিকগুলি এখন আমাদের সমাজ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে তথাকথিত 'প্রগ্রেসিভ ইয়ুথরা'। বুঝতেই পারছে না কত কিছু তারা হারালো। এক্ষেত্রে সন্তান প্রতিপালন, সন্তানকে শিক্ষিত, সংস্কারিত করে তোলার মতো বিষয়ে মায়েদের ভূমিকা সর্বাধিক।

তবে সুখের কথা সবটাই অবক্ষয়ে চলে গিয়েছে এমনটা মনে করেন না এক শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞানী। অনেকেই আবার একান্নবর্তী পরিবারে ফিরে আসার কথা ভাবছেন। এখন তারা হয়তো সংখ্যায় অল্প, কিন্তু প্রশাখা তো নিয়ত বিস্তার লাভ করেই। □

কীভাবে হাত ধুলে দূরে থাকবে ইনফেকশন?

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

করোনার সময় সুস্থ থাকার জন্য বারবার হাত ধোয়ার উপর জোর দেওয়া হতো। আসলে সবরকম সংক্রমণ রোধেই হাত ধোয়া খুব জরুরি। কারণ যে কোনো আক্রমণ সব থেকে বেশি ছড়ায় হাত দিয়ে। রোগী এবং সংক্রামিত ব্যক্তি— এই দু'জনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এমনও হতে পারে একজন ব্যক্তি রোগী নন, কিন্তু জীবাণু বহনকারী। শরীরে জীবাণু প্রবেশ করা ও রোগের উপসর্গ দেখা দেওয়ার মাঝের সময়কে বলা হয় ইনকিউবেশন পিরিয়ড। করোনার সময় এই বিষয়গুলি আকছার দেখা গিয়েছিল। ফলে রোগী নন অথচ সংক্রামিত ব্যক্তি যদি কোনো জিনিসে হাত রাখেন বা তাঁর সর্দি, কাশি থেকে জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা থেকে যায়। বিভিন্ন ভাইরাসজনিত রোগ এক্ষেত্রে হয়ে থাকে। মূলত নাক দিয়ে সেগুলি ঢোকে। আমরা অনেক সময় অজান্তেই চোখে-মুখে-নাকে হাত দিয়ে ফেলি। হাত ধুলে এই ধরনের সংক্রমণ অনেক সময় এড়ানো যায়। তাই নিজেকে বাঁচানোর জন্য হাত ধোয়াটা প্রয়োজন।

হাত ঠিক ভাবে না ধুলে, কী কী জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে?

বুক ও পেটের সংক্রমণ যে সমস্ত জীবাণুর মাধ্যমে হয় (ব্যাকটেরিয়া/ভাইরাস), সেই সবগুলির জন্য হাত ধোয়া দরকার। ইনফ্লুয়েঞ্জা, কোভিড, অ্যাডিনো, যে কোনো সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, জন্ডিস, পেট খারাপ-সবক্ষেত্রে হাত ধোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

কখন হাত ধোবেন?

মনে রাখতে হবে পাঁচটি সময়ে হাত ধোয়া প্রয়োজন।

১. যে কোনো রোগী বা সংক্রমিত ব্যক্তিকে স্পর্শের আগে হাত ধুতে হবে। এটা আপনার জন্য যেমন জরুরি, একইভাবে সংক্রমিত ব্যক্তির শরীরে যেন অন্য কোনো জীবাণু ঢুকতে না পারে, সে কারণেও দরকার। কোনো শিশু, বয়স্ক মানুষের সংস্পর্শে আসার আগেও হাত ধোয়াটা জরুরি। পোষ্যের গায়ে হাত দেওয়ার পরেও হাত ধুয়ে নিন।

২. কোনো ব্যক্তির বডি ফ্লুইড (যেমন কফ বা লালা, থুতু) যদি লেগে যায়, তাহলেও হাত ধোয়া গুরুত্বপূর্ণ।

৩. মূলত স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্ষেত্রে দুটি প্রযোজ্য। যে কোনো রকম মেডিক্যাল প্রসিডিয়োরের আগে ও পরে হাত ধোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. কোনো সংক্রামিত ব্যক্তি বা রোগীর বিছানা, বালিশ, আসবাব বা তার আশপাশের জায়গায় হাত রাখার পরে অবশ্যই হাত ধুতে হবে। যদি দেখেন কোনো ব্যক্তি সর্দি বা কাশি হয়েছে, তার কাছে যাওয়ার আগে ও পরে হাত ধুয়ে নেবেন। ধোবেন সাবান দিয়ে।

হাত ধোয়ার কয়েকটি মূল সময় :

১. বাইরে থেকে বাড়িতে আসার পর।

২. যখন হাত মুখের কাছে যাচ্ছে, অর্থাৎ খেতে বসার আগে ও পরে। চামচ দিয়ে খেলেও হাত ধোয়াটা জরুরি। রাস্তায় কিছু খেলেও হাত ধুয়ে খাওয়াটা দরকার।

৩. ঘুমানোর সময় আমাদের হাত নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে কোথায় কোথায় চলে যায়, আমরা কেউ জানি না। ফলে সেখানেও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। শোয়ার আগে অবশ্যই হাত ধুয়ে নেবেন।

কী দিয়ে হাত ধোবেন?

হাত দু'ভাবে নোংরা হতে পারে। প্রথমত, হাতে ধুলোবালি ইত্যাদি লেগে ময়লা হয়েছে, সেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হচ্ছে হাত পরিষ্কার, কিন্তু আসলে তা নয়। প্রথম ক্ষেত্রে, অর্থাৎ দৃশ্যত হাত ময়লা হলে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুতে হবে। তারপর হাত স্যানিটাইজ করে নিতে পারেন।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ধরা যাক, আপনি বাড়িতে রয়েছেন। হাতটা আপাতভাবে দেখে মনে হচ্ছে পরিষ্কার, সেক্ষেত্রে কিছু খাওয়ার আগে হাতটা স্যানিটাইজ করে নিন। ক্লোরহেক্সিডিন ২.৫ শতাংশ এবং ইথাইল অ্যালকোহল ৭০ শতাংশ রয়েছে, এমন অনুপাতে থাকা স্যানিটাইজার ব্যবহার করবেন। মাথায় রাখবেন, হাত ধোয়া আর স্যানিটাইজ করার বিকল্প কিছু নেই।

হাত ধোয়ার পদ্ধতি কী?

হাত পরিষ্কার করার জন্য ছ'টি ধাপে হাত ধুতে হবে।

১. প্রথমে দু'হাতের তালু ঘষুন।

২. হাতের আঙুল দিয়ে হাতের পিছন দিকটা ঘষতে হবে।

৩. হাতটা মুঠো করে হাতের গাঁটগুলি ধুয়ে নিন।

৪. আঙুলের ফাঁকগুলি পরিষ্কার করুন।

৫. বুড়ো আঙুল আলাদা করে ধুতে হবে।

৬. কবজি পর্যন্ত ভালো করে ধুয়ে নিন। মোট ৪৯০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

মনে রাখবেন, হাত ধোয়া কেবল নিজের জন্য নয়, নিজের প্রিয়জনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, পরিষ্কার হাত মানেই সুস্থ জীবন। □

কৃপা কল্পতরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

রবিব্রত ঘোষ

দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভূধর।
অভ্যুত্থনামধর্মস্য তদা বেশান্ বিভর্ম্যহম্।।
দেবদৈত্যবিভাগশ্চাপ্যত এবাভবন্নৃপ।।
যে ন কুর্বন্তি তদ্ ধর্মং তচ্ছিক্ষার্থং ময়া সদা।
সম্পাদিতাস্তু নরকাস্ত্রাসো যচ্ছ্রবণাদ্ভবেৎ।।
(দেবীভাগবত: সপ্তম স্কন্ধ, ৩৯.২২-২৪)

অর্থাৎ 'হে ভূধর! যে যে সময়ে ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুদয় হয়, অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি নির্দিষ্ট ধর্ম-কর্ম পরিত্যাগ করে অপর শাস্ত্রগ্রন্থ আশ্রয় করে ধর্মের নামে অধর্ম হতে শুরু করে তখনই অধর্মকে বিনাশ করতে ভূমণ্ডলে আমি আসি নানা বেশ ধরে, নানা রূপে আবির্ভূতা হই।'

ঠিক এইরকমই একটি শ্লোক পাওয়া যাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।

আসলে ভগবানের বার্তাটা খুব পরিষ্কার যখনই জগতে সংকট দেখা দেবে, তিনি আবির্ভূত হবেন, ভক্তদের রক্ষা করবেন এবং দুষ্কৃতীদের দমন করবেন আর নতুন পথ তৈরি করে দিয়ে যাবেন। শ্রীরামচন্দ্র থেকে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, চৈতন্য সবার ক্ষেত্রেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। শ্রীভগবান বার বার আবির্ভূত হয়েছেন এবং একটি নতুন পথ আমাদের কাছে উপহার দিয়ে গেছেন। আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি, ভক্তজনেদের উদ্ধার হয়েছে, সভ্যতা সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে উপস্থিত হয় এক নতুন চ্যালেঞ্জ। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনে ভারতীয় ধর্ম তখন ভীষণ ভাবে নিন্দিত। এই সময়েই আবির্ভূত হন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ৫০ বছর ব্যাপী তার মর্ত্যলীলার বিচিত্র বিস্ময় ১ জানুয়ারির কল্পতরু লীলা। যার মধ্য দিয়ে তিনি অকাতরে কৃপা দান করেন। সাধনার শেষ পর্যায়ে এই মানুষটি ছাদের উপরে উঠে ব্যাকুল ভাবে ডেকেছিলেন ওরে কে কোথায় আছিস আয়। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই তখনকার জ্ঞানী গুণী মানুষেরা এসেছিল এবং সঙ্গে এসেছিল এক ঝাঁক নতুন যুবকেরা। নতুন পরিস্থিতিতে ধর্মকে নতুনভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার তাগিদ তার ছিলই। একবার বলেই ছিলেন যাবার আগে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাব। বলতে চেয়েছিলেন জানিয়ে দিয়ে যাব আমি কে? কি করতে এসেছি এবং কেন তা করছি। যখন তাঁর শেষ অবস্থা আর কয়েক মাস আটেকের মধ্যেই জীবনাবসান ঘটবে, তখন হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে গেলেন মানুষকে অকাতরে কৃপা বিতরণ করে জানিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি কে। ত্রেতায় তিনি শ্রীরাম, দ্বাপরে তিনি শ্রীকৃষ্ণ কলিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীকার, স্বামী সারদানন্দ লিখছেন, ঠাকুর তখন কল্পতরুর মতো হইয়া তিনি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিতেন তুই কি চাস। ওইরূপ ভাবাপন্ন হইতে আমরা ঠাকুরকে নিত্য দেখিয়াছি আর দেখিয়াছি ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি।

রামচন্দ্র দত্তের লেখা থেকে জানতে পারি, এর আগের সপ্তাহে জনৈক ভক্ত সেবক হরিশ মুস্তাফির পরিত্রাণের জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কোনো উত্তর দেননি। কিন্তু পয়লা জানুয়ারির দিন হরিশ পরমহংসদেবের কাছে গেলে তিনি হরিশকে কৃপা করেন, কৃতার্থ করেন। হরিশ আনন্দে উন্মাদে কাঁদতে কাঁদতে নীচে এসে ওই ভক্তদের বললেন, 'ভাইরে, আমার আনন্দ যে ধরে না। এ কি ব্যাপার! জীবনে এমন ঘটনা একদিনও দেখিনি।' সেদিন ছিল ছুটির দিন তাই সকাল থেকেই ভক্তরা সমাগত। উদ্যানবাটীর গাছতলায় ভক্তরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন। এমন সময় শ্রীঠাকুর দেবেন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার দোতলায় ঠাকুরের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেবেন্দ্র সেখান থেকে ফিরে এসে অপেক্ষমান ভক্তদের বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'রাম (রামচন্দ্র দত্ত) যে আমায় অবতার বলে, এ কথাটা তোমরা স্থির করো দেখি। কেশবকে তাঁর শিষ্যরাও অবতার বলত।'

ঘটনাটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় বিকালে। ঠাকুর তাঁর ভাইপো

রামলাল চট্টোপাধ্যায়কে বললেন, 'দেখ রামলাল, আজ ভালো আছি বলে মনে হচ্ছে, তা চল একটু নীচে বেড়িয়ে আসি।' উত্তরে তিনি বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি তো ভালোই আছেন। চলুন যাই।' ঠাকুর একটা ঢাকা টুপি পরলেন, হাতে একটা ছড়ি নিলেন। আর রামলাল দাদা তাড়াতাড়ি গায়ে একটা চাদর দিয়ে ঠাকুরকে উপর থেকে ধরে নীচে নিয়ে এলেন। সময় কমবেশি বিকেল তিনটে। শ্রীরামকৃষ্ণ বেড়াবার জন্য দোতলা থেকে নীচে নেমে এলেন। তাঁকে দেখেই উদ্যানে সমবেত ভক্তরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন, প্রণাম করলেন। তিনি নীচের হলঘরের পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে উদ্যানের পথে নেমে দক্ষিণমুখী ফটকের দিকে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে থাকেন। ভক্তরা কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তাঁকে অনুসরণ করতে থাকেন।

কারোর মুখে কোনো কথা নেই। সকলেই আনন্দ-ঘন মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় রূপের দিকে। রোগজর্জর দেহ, জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা— সে-সব যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের দেবদুর্লভ রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে রামচন্দ্র দত্ত বলেছেন, 'সেইদিনকার রূপের কথা স্মরণ হইলে আমরা এখনো আশ্চর্য হইয়া থাকি। তাঁহার সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত এবং মস্তকে সবুজ বনাতের কান-ঢাকা টুপি ছিল, কেবল মুখমণ্ডলের দিব্যজ্যোতিতে দিকমণ্ডল আলোকিত হইয়াছিল। মুখের যে অত শোভা হইতে পারে, তাহা কাহারও জ্ঞান ছিল না 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে' অক্ষয়কুমার সেন বলেছেন— আজি মনোহর বেশ প্রভুর আমার। বারেক দেখিলে কভু নহে ভুলিবার।/পরিধান লালপেড়ে সুতার বসন।/গায়ে বনাতের জামা সবুজ বরণ। সেই কাপড়ের টুপি কর্ণমূল ঢাকা।/মোজা পায়ে চটি জুতা লতাপাতা আঁকা।।' হঠাৎ ঠাকুরই গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন করে বললেন, 'গিরিশ তুমি যে সকলকে এত কথা (ঠাকুরের অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলে বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কী দেখেছ, কী দেখেছ, কী বুঝেছ'? ঠাকুর বলতেন, গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।

এই প্রশ্নে সমকালীন বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাঁর পদপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে ভূমিতে জানু সংলগ্ন করে বসে পড়লেন, তারপর ঊর্ধ্বমুখে করজোড়ে গদগদস্বরে বলে উঠলেন, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক আর কি বলতে পারি?' গিরিশের শুদ্ধ অন্তরের সরল বিশ্বাস তাঁর প্রতি শব্দ উচ্চারণ ব্যক্ত হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ খুশি হলেন। গিরিশের উক্তির পর দেখা গেল ঠাকুরের শরীর রোমাঞ্চিত। তিনি গভীর ভাব সমাধিতে মগ্ন। এরপরই তার সেই বিখ্যাত উক্তি, 'তোমাদের আর কী বলব? আশীর্বাদ করি চৈতন্য হোক।' ভক্তদের প্রতি প্রেম ও করুণায় বিগলিত হয়ে তিনি ওই কথাগুলি বলামাত্রই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন।

এর মধ্যেই ভক্তরা শুরু করেছিলেন প্রণাম। কেউ কেউ আশেপাশের গাছ থেকে ফুল নিয়ে এসে পাদপদ্মে নিবেদন করেছিলেন। অর্ধবাহ্যদশায় প্রথম তিনজনকে ঠাকুর স্পর্শ করেন এবং হাত দিয়ে তাঁদের বুকের কাছে নীচের থেকে ওপর হস্তও চালনা করেন তাতেই তাদের মধ্যে ভাবাবেগ দেখা এবং অনেক দিব্যদর্শনও হতে থাকে।

এই দেখে রামচন্দ্র নবগোপাল ঘোষকে বলেন, করছেন কি দেখুন ঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন। নবগোপাল ঘোষ ঠাকুরের প্রার্থনা করেন, প্রভু আমার কি হবে? ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন ধ্যান জপ করতে পারবে? নবগোপাল তাতে সম্মতি না দিলে তখন জিজ্ঞাসা করেন তাহলে একটু একটু জপ করতে পারবে! নবগোপাল তাতেও ইতিবাচক সাড়া না দিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন আমার নাম একটু একটু করতে পারবে! নবগোপাল তখন বলেন তা খুব পারবো শুনে ঠাকুর বলেন তাহলেই হলো আর কিছু করতে হবে না।

রামলাল দাদা পিছনে ছিলেন তিনি ভাবছিলেন তাহলে আমার কি হলো। আমি কি কেবল গাড়ু গামছা বইয়েই বেড়াবো? এই কথা ঠাকুর বুঝতে পেরে হাত বাড়িয়ে বলেন আয় রামলাল সামনে আয়। ঠাকুরের স্পর্শে রামলালদার দিব্যদর্শন শুরু হয় রামলালদা পরে বলেছিলেন আহা সে কি রূপ কি আলো।

স্বামী সারদানন্দ বলেছেন, ওইদিন ঘটনাস্থলে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে মাত্র আট-দশজনের নামই স্মরণে আছে। তাঁরা হলেন গিরিশ, অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী (রায়), হারান, রামলাল, অক্ষয় এবং সম্ভবত কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এদের মধ্যে ঠাকুর অক্ষয়কুমারকে নিজের কাছে ডেকে এনে তাঁর বক্ষ স্পর্শ করে কানে 'মহামন্ত্র' দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর মধ্যে অপরূপ কবিত্বশক্তির বিকাশ ঘটে এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' পদ্যাকারে রচনা করে এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেন।

সবথেকে বিস্ময়ের ব্যাপার, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কল্পতরুরূপে তাঁর গৃহী ভক্তদের অযাচিত করুণা বিতরণ করে চলেছেন, তখন সেখানে তাঁর কোনো সন্ন্যাসী-শিষ্য বা ত্যাগী-ভক্ত উপস্থিত ছিলেন না। নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্যরা পূর্ব রাত্রে দীর্ঘ সময় সাধন-ভজনে নিযুক্ত ছিলেন বলে সেই সময় ঘুমিয়ে ছিলেন। লাটু মহারাজ এবং স্বামী সারদানন্দ দোতলার বারান্দা থেকে ওই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেও তাঁরা কেউই ঘটনাস্থলে যাননি। প্রকৃতপক্ষে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী জীবের প্রতিই করুণা করেছিলেন, যাঁদের একজন ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ, তিনি বার বার শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে ছুটে ছুটে গেছেন। 'কল্পতরু' শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বক্ষস্থল স্পর্শ করার পর তাঁর মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিল। অনেক দিব্য অনুভূতি হয় সবাইকে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করে ওরে কে কোথায় আছিস চলে আয়।

তিনি লিখছেন, 'আকাশ, বাড়ি, গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি যেদিকে যাহা কিছু দেখিতে লাগিলাম তাহারই ভিতরে ঠাকুরের প্রসন্ন হাস্যদীপ্ত মূর্তি দেখিতে লাগিলাম।' কিন্তু এই অবস্থা তিনি বেশিদিন সহ্য করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত আবার ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যান এবং পরে এই প্রার্থনা জানানোর জন্য চরম অনুতপ্ত হন।

কৃপা বিতরণের এই কল্পতরুর আসর থেকে কেউ বাদ পড়ল কিনা দেখতে গিরিশ হাজির হন রান্নাঘরে। সেখানকার পাচককেও ঠাকুরের পদপ্রান্তে হাজির করেন। সেও ঠাকুরের কৃপা লাভ করে। রামচন্দ্র দত্তের লেখা থেকে জানা যায় আরও ভক্তদের আসার আগেই ঠাকুরের সহজ অবস্থা ফিরে আসে। তিনি নিজের ঘরে ফিরে যান। অবশ্য এ ফিরে যাওয়া দৈহিক অবয়বের পিছনে রেখে গেলেন ঈশ্বরীয় সত্তা।

সার্ধশতবর্ষের শুভালোকে সার্ধশত কণ্ঠে দেশ বন্দনা— ‘বন্দে মাতরম্’

সংস্কার ভারতী, পশ্চিমবঙ্গের তত্ত্বাবধানে রাজ্যের জেলায় জেলায় ‘বন্দে মাতরম্’ গৌরবগান কার্যক্রমের সূচনা হলো। গত ১৫ ডিসেম্বর ঐতিহ্যবাহী গোবরডাঙ্গা জমিদার বাড়ি প্রাঙ্গণে সার্ধশতকণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম্’ গৌরবগান পরিবেশন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল সংস্কার ভারতী উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৭টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত অখণ্ড ‘বন্দে মাতরম্’ গীত পরিবেশন করেন ১৫০ জন শিল্পী। ‘বন্দে মাতরম্’ গীত রচনার সার্ধশতবর্ষকে সম্মান জানাতে সংস্কার ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ পরিবার এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামীদিনে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রকাশ্য স্থানে সার্ধশতকণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম্’ গৌরবগান পরিবেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে ‘ভিশন ভারত-২৫’

গত ৫ ডিসেম্বর বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন (মুর্শিদাবাদ শাখা)-এর পক্ষ থেকে ‘ভিশন ভারত-২৫’ নামক একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির লক্ষ্য ছিল সুস্থ জীবনশৈলী-সহ সমৃদ্ধ এবং সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত, সচেতন সমাজ নির্মাণ। সহযোগিতায় ছিল ছত্রপতি শিবাজী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের স্বনামধন্য চিকিৎসক-সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এদিন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কল্যাণী এআইআইএমএস-এর ডিন অধ্যাপক ডাঃ অজয় মল্লিক, অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা, জনপ্রিয় চিকিৎসক ডাঃ নির্মল কুমার সাহা, ডাঃ সুনন্দ দে, প্রাক্তন বিচারপতি প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ। উদ্বোধনী কার্যক্রমের পর দর্শকপূর্ণ সভাগৃহে ভাবগম্ভীর পরিবেশে ডাঃ অরিন্দম চৌধুরীর সমধুর কণ্ঠে পূর্ণ ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীত পরিবেশিত হয়। মনোমুগ্ধকর ভরত নাট্যম প্রদর্শনের মাধ্যমে সকলের মন জয় করে নেয় ছোট্ট মৈত্রেয়ী অধিকারী। পরবর্তী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা চক্র। অংশগ্রহণ করেন সুদীপ্ত গুহ, ডাঃ নির্মল সাহা, প্রসূন মৈত্র, দেবজ্যোতি চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্টজন। বক্তারা সকলেই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন-সহ বিবিধ সামাজিক সমস্যা নিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। এরপর অনুষ্ঠিত হয় সেতার বাদন, উপস্থাপনে ছিলেন ডাঃ মেঘনাদ ভৌমিক। অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল নাট্যগোষ্ঠী ব্রাত্যজনের পরিবেশনায় ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী অবলম্বনে নাটক— ‘কেশরী হত্যা’। অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনায় ছিলেন ডাঃ নির্মল সাহা, ডাঃ মৃন্ময় অধিকারী ও ডাঃ তন্ময় টিকাদার। সহযোগিতায় ছিলেন ডাঃ চিন্ময় হালদার ও ডাঃ আলাপন মুখোপাধ্যায়।

কর্মযোগীর বার্ষিক সাধারণ সভা ও মা সারদা সেবা ভবনে অলকা দাস স্মৃতি ছাত্রাবাসের উদ্বোধন

গত ১১ ডিসেম্বর দিনটি ছিল শ্রীশ্রী সারদা মায়ের ১৭৩তম জন্মতিথি। এই পবিত্র দিনে মা সারদা সেবা ভবনে, অলকা দাস স্মৃতি ছাত্রাবাস উদ্বোধন এবং কর্মযোগীর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বাকাদহ নামক বন জঙ্গল বেষ্টিত একটি নির্জন অঞ্চলে এদিন অনুষ্ঠানটির সূচনা হয় পূজা ও যজ্ঞের মাধ্যমে। গ্রামের মায়েরা এবং সেবিকা সমিতির বোনেরা লাল পাড় শাড়ি পরে কলসী করে নিকটবর্তী পুষ্করিণী থেকে জল নিয়ে আসে। পূজার শেষে সবাইকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

এরপর সকাল ১১টার সময়, শুভ মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী নারকেল ভেঙে গৃহপ্রবেশ করেন। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সেবা ভবন প্রাঙ্গণ। অধ্যাপক রুবেল পাল দৃপ্ত কণ্ঠে দীপ প্রজ্বলন মন্ত্র এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করেন। মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিরা শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তির পদতলে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। মঞ্চে উপবিষ্ট— সুনীলপদ গোস্বামী, অদ্বৈতচরণ দত্ত, সঙ্ঘের সহ-পূর্বক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাতো, কর্মযোগীর সভাপতি শান্তনু রুদ্র ও অন্যান্য অধিকারীদের পরিচয় করান রবীন্দ্রনাথ খাঁড়া। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তর বাঁকুড়া জেলা সঙ্ঘচালক জয়ন্ত শীল, সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ বলরাম দাস রায়, রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর সদস্য মনোজ চট্টোপাধ্যায়, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সেবা প্রমুখ প্রদ্যুৎমল বসু, অলকা দাসের কন্যা রীতা মিত্র। সংগঠনকে যিনি এই জমিটি দান করেন সেই মালতী টুডুও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মানিত করা হয়। এরপর সংগঠম মন্ত্রপাঠ করেন শুভেন্দু সন্নিগ্রাহী। বিশিষ্ট অতিথিরা বার্ষিক স্মরণিকা উন্মোচন করেন। সম্পাদকের প্রতিবেদন পাঠ করেন নারায়ণ মণ্ডল। হিসাব পেশ করেন সুব্রত দত্ত। কর্মযোগীর নতুন পরিচালন সমিতি নির্বাচন পরিচালনা করেন কর্মযোগী ট্রাস্ট সভাপতি নারায়ণ মণ্ডল। শান্তনু রুদ্রর সভাপতিত্বেই ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের নতুন সমিতি নির্বাচিত হয়। ওঙ্কার ধ্বনি- সহ সবাই তা অনুমোদন করেন। একক গীত পরিবেশন করেন সুদীপ ভাবক। এরপর জলধর মাহাতো তাঁর বৌদ্ধিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, এই পবিত্র ভূমিতে আমাদের জন্মগ্রহণ এবং পুণ্য তিথিতে এই ছাত্রাবাস উদ্বোধন সত্যিই স্মরণীয়। ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্মাতা আমরা। সবাই আমরা ভাগ্যবান যে, সঙ্ঘ শতবর্ষ আমরা দেখে যাচ্ছি। এই বছর হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা ও সমর্পণের শতাব্দী বর্ষ। দেশজুড়ে ১ লক্ষ ২৭ হাজার সেবা প্রকল্প স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সহ বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে সঙ্ঘকাজ প্রসারিত হয়েছে। সমাজের ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ এসেছে আজ আমাদের কাছে। আগামীদিনে এই ছাত্রাবাস আরও বড়ো হবে। সমাজ চেতনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। পরোপকার পুণ্য। অন্যের ক্ষতি করা মানে পাপ। সমর্থ গুরু রামদাস স্বামীর কথা এবং ভগিনী নিবেদিতার প্লেগ রোগীদের সেবার কথা তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। সবার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শান্তনু রুদ্র। রবীন্দ্রনাথ খাঁড়ার কণ্ঠে কল্যাণ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে প্রথম সত্রের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

দুপুর বেলা প্রসাদ গ্রহণের পর শুরু হয় দ্বিতীয় সত্রের অধিবেশন। সংগীত পরিবেশন করে কুমারী অস্মিতা ঘোষ। ছাত্র ও অভিভাবকদের পরিচয় করাতে এগিয়ে আসেন ছাত্রাবাসের অভিভাবক অনিল মুর্মু। ৯ জন ছাত্র এদিন এক হাজার টাকা শুল্ক দিয়ে ভর্তি হয়। অতিথিরা ছাত্রদের হাতে শীতের গেঞ্জি ও কলম উপহার দেন। দীপঙ্কর দাসের ভাগ্নে অঞ্জন মিত্র তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে কিছু বক্তব্য রাখেন। ছাত্রাবাস পরিচালনার সহযোগিতায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার একটি চেক প্রদান করেন। সহযোগী সংগঠন লঘু উদ্যোগ ভারতী পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ছাত্রাবাসের প্রয়োজনে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করেন। নিউ ব্যারাকপুর হতে আগত গৌতম রায় ২৩০টি উলিকটের গেঞ্জি রাইপুর ও সারেঙ্গার সংস্কার কেন্দ্রের শিশুদের জন্য প্রদান করেন। একক গীত পরিবেশন করেন দেবব্রত বারুই।

এরপর বক্তব্য রাখেন সুনীলপদ গোস্বামী। তিনি বলেন, আপনারা যে মন নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, তা ধরে রাখতে হবে। মহাভারতে অর্জুনের মাধ্যমে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বরূপ দেখাতে হয়েছিল। এই পবিত্র স্থানে মা সারদার ভূমিতে আমরা ছাত্রাবাস নির্মাণ করেছি। জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমায়ের জন্মভূমি। মা বলতেন, তোমরা জীবনে

সবকিছুর মধ্যে ভালো জিনিস দেখবে। সবকিছুতে পজিটিভ দেখাটা আমাদের সকলের কর্তব্য। লাল মাটি বিষ্ণুপুর বিধর্মীদের ঢুকতে দেয়নি। ব্রিটিশ আমলে আন্দামানে সেলুলার জেলে ৭০০ জন জেলবন্দির মধ্যে ৪০০ জন বাঙ্গালি বিপ্লবী ছিলেন। সেবার মধ্যে সমর্পণ অর্থাৎ আমাদের মিশনকে তুলে ধরতে হবে। মানবতার বাণী প্রচার করতে গিয়ে স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। কলকাতার বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া আজ এক গর্বের বিষয়। এই জঙ্গলে মা সারদা ছাত্রাবাস সাধারণ মানুষের মঙ্গলের কাজে লাগবে। এছাড়াও তিনি যশপুর আশ্রমের কথা উল্লেখ করেন, যা নাগাল্যান্ড তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ছাত্রাবাস নির্মাণের প্রেরণা দিয়েছিল।

অধিবেশনের শেষ বক্তা অদ্বৈতচরণ দত্ত বলেন, গীতা মানে ত্যাগ। মা সারদামণি ত্যাগের প্রতিমূর্তি। দুর্ভিক্ষের সময় যখন গোটা গ্রাম ক্ষুধার্ত, তখন শ্রীশ্রী মা সকলকে নিজের হাতে খাওয়াতেন এবং নিজের হাতে বাতাস করতেন। মা হলেন সাক্ষাৎ জগজ্জননী। ৪০ বছর আগে আমি এই জঙ্গলে এসেছিলাম। মা সারদা ছাত্রাবাসের পাশাপাশি ভগিনী নিবেদিতা ছাত্রী নিবাস নির্মাণ করতে হবে আগামী দিনে। বিবাহ অনুষ্ঠানে অধিক খরচ না করে সেবাকাজে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। এরপর 'সুরের বাঁধন'-এর পক্ষ থেকে সমবেত কণ্ঠে 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গানটি গাওয়া হয়। এরপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নারায়ণ মণ্ডল। সঙ্ঘ ও সেবিকা সমিতির প্রার্থনা আলাদা করে হয়। শেষে চা চক্রের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সিউড়ীতে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

১৯৮৭ সালে বীরভূম জেলা সদর সিউড়ীতে শিক্ষক ও সমাজসেবক নিরঞ্জন হালদারের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় বীরভূম জেলার প্রথম সরস্বতী শিশুমন্দির। এসপি মোড় সংলগ্ন অরবিন্দ পল্লী সরস্বতী শিশুমন্দির সোসাইটির উদ্যোগে এবং পুরুলিয়া জেলার রামচন্দ্রপুর-স্থিত নেতাজী আই হসপিটালের সহযোগিতায় গত ১৪ ডিসেম্বর সিউড়ীর অরবিন্দ পল্লী সরস্বতী শিশুমন্দিরে আয়োজিত হয় বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। বিভিন্ন এলাকার দুই শতাধিক মানুষ এই শিবিরে অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে শতাধিক জনের চোখের ছানি অপারেশন হয় গত ১৫ ডিসেম্বর রামচন্দ্রপুর হাসপাতালে। চক্ষু পরীক্ষার পর সেদিন দুপুরেই তাঁদের বাসে করে রামচন্দ্রপুরে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করানো হয় এবং অপারেশনের পরে পুনরায় সিউড়ীতে ফিরিয়ে আনা হয়। তাঁদের যাতায়াত, অপারেশন সবই বিনামূল্যে হয়। পরে প্রয়োজনমতো তাঁদের চশমা, লেন্স, ওষুধও দেওয়া হবে। এদিনের চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শিশুমন্দিরের সভাপতি লক্ষ্মণ বিষ্ণু, সম্পাদক পরিতোষ হাজরা, শিক্ষক পতিত পাবন বৈরাগ্য এবং শিশুমন্দিরের আচার্য-আচার্যা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। চার বছর ধরে এই শিবির চলছে এবং সারা বছর ধরেই বিভিন্ন রকম সমাজসেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলে জানান সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য নির্মল ঠাকুর। বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানান শিশুমন্দিরের কোষাধ্যক্ষ তথা সমাজসেবক দেবব্রত মাহান্ত।

বিষ্ণুপুরে সেবা ভারতীর উদ্যোগে রক্তদান শিবির

গত ১৪ ডিসেম্বর উত্তর বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর নগরের সুদর্শন ভবনে সেবা ভারতীর উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ওই রক্তদান শিবিরে ৬ জন মাতৃশক্তি-সহ মোট ৮৬ জন রক্ত সমর্পণ করেন। এই মহতী কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন উত্তর বাঁকুড়া জেলা সঙ্ঘচালক জয়ন্ত শীল, উত্তর বাঁকুড়া জেলা সেবা প্রমুখ সমীরণ কর, বিষ্ণুপুর নগর কার্যবাহ প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

মহাবোধি সোসাইটি হলে নেতাজী অনুগামীদের সম্মেলন

সম্প্রতি নেতাজীর স্বঘোষিত কন্যা ড. অনিতা পাফ দেশবাসীর কাছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মিথ্যা চিতাভস্ম জাপানের রেনকোজি মন্দির থেকে ভারতে এনে তাইওয়ানে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার মিথ্যা রটনাকে মান্যতা দিতে আর্জি জানিয়েছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিবারের কিছু ব্যক্তিও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে এই দাবি পূরণের আর্জি জানিয়েছেন। অথচ ১৯৫৬ সালে তাইওয়ান সরকার প্রকাশিত রিপোর্ট, ওই বছরই নেতাজীর সেজ দাদা সুরেশচন্দ্র বসু প্রকাশিত 'ডিসেনশিয়েন্ট রিপোর্ট' এবং ২০০৫ সালে বিচারপতি মনোজ কুমার মুখোপাধ্যায় কমিশনের পেশ করা রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকু বিমানঘাঁটিতে কোনো বিমান দুর্ঘটনাই হয়নি। ভারতে এই ভুয়ো চিতাভস্মকে আনার ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গত ১৮ ডিসেম্বর মধ্য কলকাতা-স্থিত মহাবোধি সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত হয় নেতাজী অনুগামীদের সম্মেলন। বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্যা অধীশা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'INA-anthem'-এর মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র অশোকনাথ বসুর দুই কন্যা জয়ন্তী রক্ষিত ও তপতী ঘোষ, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আইএনএ সিক্রেট সার্ভিসের সদস্য ডাঃ পবিত্রমোহন রায়ের পুত্র রণেন্দ্র মোহন রায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী, বিচারক ও লেখক বিপ্লব রায়, সমাজসেবী ইন্দ্রাশিস ভট্টাচার্য্য প্রমুখ নেতাজী অনুগামী। বক্তারা দাবি জানান— (১) বিচারপতি মনোজ কুমার মুখোপাধ্যায় কমিশন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিল, নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনা মিথ্যা; সেই রিপোর্টটি পুনরায় সংসদে পেশ করে নেতাজী অন্তর্ধান রহস্যের স্থায়ী সমাধানের বিষয়টি ত্বরান্বিত করা হোক। (২) ১৯৫৬ সালে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনাস্থলে তদন্ত করে তাইওয়ান সরকার রিপোর্টে জানিয়েছিল, বিমান দুর্ঘটনার কোনো প্রমাণ নেই। সেই রিপোর্ট এবং সেই সংক্রান্ত যাবতীয় নথি জনসমক্ষে আনুক কেন্দ্রীয় সরকার। (৩) সারা বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলির কাছে থাকা নেতাজী সুভাষচন্দ্র সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র প্রকাশের জন্য ভারতের বিদেশমন্ত্রক সক্রিয় হোক। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকুতে যেহেতু কোনো বিমান দুর্ঘটনা হয়নি, তাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়নি বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে ধরে নেওয়া যায়। দেশনায়কের স্বমহিমায় দেশে প্রত্যাবর্তন সম্ভব না হলেও, তাঁর ইতিহাস সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশবাসী যেন তাঁর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারে এই বিষয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সক্রিয় হবেন— এই আশা প্রকাশ করেন বিশিষ্ট নেতাজী অনুগামীরা। সম্মেলনে উপস্থিত নেতাজী অনুগামীদের উদ্দেশে ইন্দ্রাশিস ভট্টাচার্য্য জানান যে, ২০২২ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিবারের একাংশের পক্ষ থেকে সৌম্যশঙ্কর বসু কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। মামলার নম্বরটি হলো— ডব্লুপিএ(পি) ৫৮১ অফ ২০২২। এই মামলায় তিনি সেই তথাকথিত চিতাভস্ম জাপান থেকে ভারতে আনার আবেদন জানান। নেতাজী অনুগামীরা এই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। আদালতে তাঁদের পক্ষ উপস্থাপন করেন বরিষ্ঠ আইনজীবী রুদ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য্য। আবেদনকারীর দাবির বিপক্ষে বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ-সহ এফিডেভিট পেশ করেন তিনি। সেই এফিডেভিটের বিপ্রতীপে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ সাপ্লিমেন্টারি এফিডেভিট পেশ করার নির্দেশ দিলেও কোনোরকম সাপ্লিমেন্টারি এফিডেভিট পেশ করেননি বসু পরিবারের একাংশের নিযুক্ত আইনজীবী। ২০২৩ সালের ৯ জানুয়ারি হতে এই মামলায় আর কোনো অগ্রগতিও ঘটেনি। বসু পরিবারের এই অংশটির পক্ষ হতে ভবিষ্যতে ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি হলে নেতাজী অনুগামীরা পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবে এবং এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করবে বলেও জানান ইন্দ্রাশিস ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইতিহাস গবেষক ও লেখক সৈকত নিয়োগী ও সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত।

সকলের বক্তব্য শেষ হলে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। □

জাতীয় গ্রন্থাগারে হুতাত্মা বাবু গেনুর স্মরণে ‘স্বদেশী বলিদান দিবস’

গত ১২ ডিসেম্বর কলকাতা-স্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারের ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভাষা ভবন অডিটোরিয়ামে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ ও স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে এবং জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও বড়বাজার লাইব্রেরির সহযোগিতায় উদ্‌যাপিত হলো ‘স্বদেশী বলিদান দিবস’। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ড. সিভি আনন্দ বোস। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপালজী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের ন্যাশনাল কো-কনভেনার এবং স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ধনপত রাম আগরওয়াল, বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট শ্রীঠাকুর সমীর ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরির ডিরেক্টর ড. অজয় প্রতাপ সিংহ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত তরুণ— বাবু গেনুর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে দেশ জুড়ে প্রতি বছর উদ্‌যাপিত হয় ‘স্বদেশী বলিদান দিবস’। বিদেশি কাপড় আমদানির বিরুদ্ধে স্বদেশী ভাবধারায় জারিত আন্দোলনকর্মীদের দ্বারা আয়োজিত বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয় বাবু গেনু, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, দত্তোপন্ত বাপুরাও ঠেংড়ী ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। একক সংগীত পরিবেশন করেন প্রতিমা মণ্ডল। দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন শর্মিষ্ঠা রায়। বিশিষ্ট অতিথি শ্রীঠাকুর সমীর ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের ঋষি-মনীষীরা বেদ-উপনিষদে বলেছেন নৈতিক জীবন যাপন করতে হবে। বস্তুবাদী চিন্তাধারায় জারিত উন্নয়নের পাশাপাশি, বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিকতা— দুইয়ের মিলনে জীবন যাপন করতে হবে এবং তার জন্য স্বদেশী দ্রব্য ও ‘স্ব’-এর ভাব বা চেতনাকে গ্রহণ করতে হবে।

ড. অজয় প্রতাপ সিংহ বলেন, স্বদেশী দ্রব্য আমরা ব্যবহার করব, কিন্তু তার গুণগত মান বিচার করে গ্রহণ করব। স্বদেশী রিসার্চ সেন্টারের মাধ্যমে দ্রব্যের গুণগত মানও পরীক্ষা করতে হবে। স্থানীয় স্তরে সবাইকে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করতে হবে এবং বিদেশি পণ্য বয়কট করতে হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ড. কৃষ্ণগোপালজী বলেন, ইংরেজ আসার আগে ভারত ছিল বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ। ইংরেজ আসার পর ভারতের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সভ্যতা কীভাবে ধ্বংস করা যায়— সর্বতোভাবে সেই চেষ্টাই করেছে। তারা বই লিখেছে এবং সেই সব বইতে উল্লেখ করেছে যে, তারা ভারতে আসার আগে আইন-আদালত-শিক্ষা-শিল্প-চিকিৎসা ইত্যাদি কিছুই নাকি ভারতে ছিল না। এই বইগুলি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়েছে। ভারত একটি বর্বর দেশ ছিল এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে তারা। তারা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে, বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হলো ভারতের তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা পড়তে আসত। সেখানে শিক্ষা অবৈতনিক ছিল। সমাজ তার দায়িত্ব নিত। আজ আমরা সবকিছুই সরকার করে দেবে, এই ভাবনায় মশগুল হয়ে বসে রয়েছি। এই ভাবনা যথাযথ নয়। সমাজের সবাই মিলে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধির ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করলে তবেই দেশ উন্নত হবে। এটাই ভারতীয় ভাবনা। সমাজের সব অংশকে মিলে মিশে সামাজিক কাঠামোকে দৃঢ় করতে হবে। তাহলে সমাজের সব ব্যবস্থা ভালো চলবে। সমাজের সর্ব স্তরে ‘স্ব’-এর বোধ জাগ্রত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ ও স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউট সেই কাজই করছে। দেশবাসীর মস্তিষ্ক থেকে বিদেশি ভাবনাকে ত্যাগ করতে হবে আগে। মানসিকতা ‘বিদেশি’ থাকলে আমরা ‘ভারতীয়’ হয়ে উঠতে পারব না। তাই আসুন আগে নিজেদের মনকে আমরা ভারতীয় করি, তাহলে ‘স্বদেশী’ আন্দোলন সর্বাঙ্গীণ সাফল্য অর্জন করবে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ড. সিভি আনন্দ বোস বলেন, ভারতের বিশ্বগুরু হওয়ার রথ চালনা করছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই শত আঘাত সত্ত্বেও এই রথটি অটুট রয়েছে। রথটির অগ্রগতি থামানো যাচ্ছে না। মোদীজীর নেতৃত্বে স্বদেশী জাগরণ এবং স্বদেশী পণ্যের বিশ্ব বাণিজ্য চলছে। এই মহতী কর্মযজ্ঞে আমাদের সকলের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পূর্বক্ষেত্র সহ-সংযোজক অম্লান কুসুম ঘোষ। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

অখিল ভারতীয় পূর্বসৈনিক সেবা পরিষদের উদ্যোগে ‘বিজয় দিবস’ উদ্‌যাপন

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সামনে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি সেনা। ভারতীয় সেনাদের এই জয় স্মরণে প্রতি বছর এই দিনটিতে উদ্‌যাপিত হয় ‘বিজয় দিবস’। গত ১৬ ডিসেম্বর অখিল ভারতীয় পূর্বসৈনিক সেবা পরিষদের উদ্যোগে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট-স্থিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু অডিটোরিয়ামে উদ্‌যাপিত হয় ৫৪তম ‘বিজয় দিবস’। যুদ্ধে বীরগতিপ্রাপ্ত ভারতীয় সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালনের পর জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এদিন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন পদ্মশ্রী ডাঃ জগদীশ চন্দ্র হালদার। তিনি এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পূর্বতন ও প্রবীণ সেনানীরা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তির উদ্দেশে স্যালুট বা অভিবাদন জানান। এরপর অনুষ্ঠানমঞ্চে পরিবেশিত হয় দেশাত্মবোধক গান ও ভক্তিগীতি।

সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের পর ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর সেনানীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এরপর স্বাগত ভাষণ দান করেন ‘অখিল ভারতীয় পূর্বসৈনিক সেবা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ’-এর সহ-সভাপতি লেফটেন্যান্ট কর্নেল শান্তিভূষণ দাশ। ‘বিজয় দিবস’ উদ্‌যাপনের বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য। এদিনের অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং দেশ গঠনে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ। ‘বিজয় দিবস’ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতের ঐতিহাসিক জয়কে স্মরণ করা হয়, যার ফলে স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশ।

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

অপার লীলাময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

দীপক খাঁ

কল্পতরু উৎসবকে কেন্দ্র করে আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে আর দিনটিও গুরুত্বপূর্ণ। ১ জানুয়ারি, ইংরেজি নববর্ষের দিন। মানুষের বন্দনার শেষ নেই, এর সীমা-পরিসীমাও নেই। অনেক ব্যক্তি কল্পনাকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্যও করেন, কিন্তু কল্পনা কি বাস্তবের মাটিতে স্থান পায়? একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, আমেরিকায় এমন লোক পাওয়া যায় না যে Disneyland-এর কথা শোনেননি। কারণ তা হলো পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ মন-বিনোদনের স্থান। এর প্রতিষ্ঠাতার নাম ওয়াল্ট ডিজনি। একবার তিনি ইংল্যান্ড ঘুরতে যান— গিয়ে দেখেন ওখানকার বড়ো বড়ো পুরনো ক্যানেলগুলি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ওখানকার লোকজনকে বলেন— দেখুন ওইসব পুরানো ক্যানেলগুলিতে অনেক ভূত-প্রেত আছে মিছিমিছি ওদেরকে অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দিয়ে বাস্তুহারা কেন করা হচ্ছে? ওদেরকে নিয়ে আমি আমেরিকায় যাব। এই কল্পনাকে মনে স্থান দিয়ে তৈরি করেন ডিজনিল্যান্ডে একটি Haunted House। এখানে এক আকর্ষণীয় দৃশ্যের অবতারণা করা হয় যে ওই Haunted House-এর ব্রিটিশ ভূতপ্রেত ডিজনিল্যান্ডে নাচছে, গাইছে, কাঁদছে, হাসছে, কেউ-বা বাইবেলের উক্তিগুলি পুনরুক্তি করে অদ্ভুত ভাবে আবৃত্তি করছে— অর্থাৎ মানুষের কল্পনার বাস্তবে রূপায়ণ হয়েছে। কল্পনায় আসে আমরা যদি আরও কিছুকাল আগে পৃথিবীতে আসতাম হয়তো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবাত্মাকে দর্শন করে আমরা আধ্যাত্মিক জগতের কিছু প্রশ্নের সারাসরি তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শুনতাম! কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর কথার মধ্যে এরূপ ভাবুকতার কল্পনার কথা উঠিয়েছেন তাঁর 'সেকাল' বলে কবিতার মাধ্যমে।

'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
দৈবে পেতাম দশম রত্ন নবরত্নের মালে।
চিন্তা দিতাম জলাঞ্জলি, থাকত নাকো ত্বরা—
মৃদুপদে যেতেম, যেন নাইকো মৃত্যুজরা।
জীবনতরী বয়ে যেত মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।'

অনুরূপ চিন্তন যদি কারো মাথায় স্থান পায়, অর্থাৎ যদি আমরা জন্ম নিতেম রামকৃষ্ণের কালে? কি হতো? সারদানন্দজীর জীবনী থেকে পাওয়া যায় তিনি আমেরিকার ভক্তদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন— ধরা যাক আপনারা রাতে একা অন্ধকারে ঘরে শুয়ে আছেন, এমন সময় যীশুখ্রিস্ট সশরীরে আপনাদের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আপনারা তখন কি করবেন? খুব ভালোভাবে ভেবে বলুন।

পরে ভক্তদের চুপ করে থাকতে দেখে তিনি নিজেই বলেন, আমি জানি আপনারা কি করবেন? আপনারা টেলিফোনে ৯১১ ডায়াল করবেন। ৯১১ ডায়াল করামাত্র অপারেটর জিজ্ঞাসা করবে কাকে চাই? পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স অথবা ফায়ার ব্রিগেড? আসলে আমরা ভীতু ভয় পেয়ে যাব। খ্রিস্টকে দেখবার জন্য আমরা প্রস্তুত নই বা হইনি। অনেকেই বলবেন— প্রভু, তুমি দেওয়ালের ওই ছবিতে ঝুলে থাক। তোমাকে কাছে দেখলে বড়ো ভয় করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থাকা অত সহজ ছিল না। আমরা শ্রীশ্রী মায়ের জীবনীতে পড়েছি— মায়ের উঠতে একটু দেরি হলে ঠাকুর নহবতের দরজার চৌকাঠের ভিতরে জল ঢেলে দিতেন। মা ও লক্ষ্মীদিদি মেঝেতে শুতেন। অনেকদিন বিছানা ভিজে যেত। তখনকার ভক্তদের আমি ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে বলি, এমন স্বামী পেলে আপনারা ডিভোর্স দেওয়ার জন্য উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিতেন!

রানি রাসমণিকে মা-কালীর মন্দিরে মোকদ্দমার চিন্তা করতে দেখে ঠাকুর দুটি চাপড় মারলেন। বরানগরের ঘাটে বসে জয় মুখুজ্জ্যে অন্যমনস্ক হয়ে জপ করছিল। ঠাকুর তাকেও দুই চাপড় মারলেন— ওঁরা সব ভাগ্যবান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চিরদিনের তরে ওদের মন ভগবদ্‌মুখী করে দিলেন। যখনই তাঁরা অন্যমনস্ক হবেন— ঠাকুরের কথা মনে

করবেন। বহু সময় ভক্তদের মননে আসবে এই কল্পনা হায়! সকাল সন্ধ্যায় যদি ঠাকুরের দুটি চড় খেতাম, কি সুন্দর ধ্যান, জপটাই না হতো।

মথুর নিজের অবর্তমানে ঠাকুরের যাতে করে না অসুবিধা হয়, তার জন্য ঠাকুরের নামে একটা তালুক লেখাপড়া করে দেবার পরামর্শ হৃদয়ের সঙ্গে করতে গিয়ে ঘটা অনর্থের সৃষ্টি করেন। ঠাকুর ওই কথা শোনা মাত্র উন্মত্ত হয়ে 'শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাস' বলে মথুরকে মারতে গেলেন। শোনা যায় মথুর দৌড়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে রক্ষা পান। লাটু মহারাজকে একদিন সন্ধ্যায় ঘুমোতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় তাকে বিদায় করে দিচ্ছিলেন। বাবুরাম মহারাজ এক রাতে দু'খানা রুটি বেশি খাওয়ায় ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে বরাদ্দের অধিক রুটি দিতে মানা করেন। মা বলেন, 'ও দুখানি রুটি বেশি খেয়েছে বলে তুমি অত ভাব ভাবো কেন? ওদের ভবিষ্যৎ তো আমি দেখব কাজেই ওদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনো গালাগালি কোরো না।'

ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ একবার দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে মনস্থ করেন, কিন্তু আলমবাজার অবধি গিয়ে ফিরে আসেন কারণ শুনেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সব মনের কথা জানেন সুতরাং গিয়ে যদি সকলের সামনে গড়গড় করে বলেন তাঁকে বিব্রত হতে হবে। সেই জন্যে ভয়ে আর ঠাকুরকে দেখতেই গেলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ লোকশিক্ষার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। 'যাকে যেমন তাকে তেমন'— এইভাবে শিক্ষা দিতেন। উত্তররামচরিতে ভবভূতি লোকাত্তর পুরুষের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা কখনো বজ্রের মতো কঠোর কখনো-বা কুসুমের মতো কোমল। এ জগতে যারা সংশয়মনা তারা চিরদুঃখী সন্দেহ তাদের সুখশান্তি ধ্বংস করে। বাইবেলে খ্রিস্ট শিষ্য টমাস 'Doubting Thomas' বলে উল্লেখিত হয়েছেন। পুনরুভ্যুত্থানের পর যীশুখ্রিস্ট শিষ্যদের সামনে আবির্ভূত হন। বন্ধুদের কাছে টমাস বলে যে, যে তখনই তা বিশ্বাস করবে যখন সে নিজহাতে যীশুর গায়ে ক্রুশচিহ্ন স্পর্শ করবে। আটদিন পর যীশু আবার সব শিষ্যদের মধ্যে আবির্ভূত হন এবং টমাসকে বলেন— 'তুমি আঙুল দিয়ে আমার হাতের ও বুকের পাশের ক্রুশচিহ্ন স্পর্শ কর। অবিশ্বাস কোরো না— বিশ্বাস কর' টমাস বলে ওঠেন— 'হে মোর প্রভু, হে মোর ঈশ্বর।' যীশু বলেন— টমাস, তুমি দেখছ যেহেতু তুমি বিশ্বাস করলে। তারাই ধন্য, যারা আমাকে দেখেনি কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করে'।

স্বামী তুরীয়ানন্দজী বলতেন— আবার কার মুখ চাহিবে? ঠাকুর লইয়া পড়িয়া থাক— দেখিবে পরে কী হয়। তাঁহাকে ঘটেপটে প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যজ্ঞানে তাঁহার সেবা পূজা সব করিয়া যাও— দেখিবে সত্যসত্যই তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যাইবে। তাঁহাতেই প্রাণমন মজাইয়া ফেল দেখি।'

অনেকেই হাহুতাশ করে বলে, 'আমাদের সংস্কার খারাপ', 'আমরা ভাগ্যহীন', 'এ জীবনে আমাদের কিছু হলো না'। এরকম নীতিমূলক কথা শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যরা পছন্দ করতেন না।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একবার ভক্তদের মহত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন : 'আমরা না হয় তাঁকে দেখে পাগল হয়েছি, কিন্তু বর্তমানকালের তোমরা যে তাঁর নাম শুনেই পাগল'।

একবার জনৈক সন্ন্যাসী সেবক মহাপুরুষ মহারাজকে বলেন : মহারাজ আমরা ঠাকুরকে দেখিনি। আপনি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। আপনার কাছে থাকতে শুনেছি, একি কম সৌভাগ্যের কথা? আপনি আছেন, তাই তো এতো সাধুসন্ন্যাসী কত ভক্ত, সকলেরই ভরপুর আনন্দ। মহারাজ খুবই আবেগভরা কণ্ঠে বললেন : ঠাকুরের বিশেষ কৃপা তোমাদের ওপর। তাই তিনি ভক্তের সেবা করিয়ে নিচ্ছেন তোমাদের দ্বারা। তোমরা ধন্য, আমিও ধন্য যে তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি। নইলে কোথায় থাকতুম, কে দেখত? একবার জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে বললেন : 'মা, তোমার ছেলেরা কেউ চোখ বুজে, কেউ চোখে চেয়ে ঠাকুরকে দেখতে পান। আমার ভাগ্যে তো মা ঠাকুরদর্শন হলো না।' মায়ের উত্তর : 'স্থানটি যদি পবিত্র হয়, মনটি যদি শুদ্ধ থাকে তবে ঠাকুরের দর্শন পাওয়া যায়।' পরে ভক্তটির মাথায় ধরে মা দৃঢ় অথচ মধুর কণ্ঠে বললেন : 'আমি বলছি ঠাকুর সামনে না এলে তোমার দেহ যাবে না। এবার তোমার শেষ জন্ম।'

স্বামী প্রেমানন্দজী একবার স্বামী গিরিজানন্দজীকে বলেছিলেন : 'তোরা কি কম মনে কচ্ছিস নাকি? শ্রীশ্রীমায়ের ছেলে যারা তারা ঠাকুরের সন্তানের চেয়ে কম নাকি? আমাদের পায়ের ধুলো সকলে নেয় বলে, আমরা খুব বড়ো হয়ে গেছি মনে করিস? আমরা ঠাকুরকে দেখে এসেছি। আর তোরা না দেখে এসেছিল। তোরাই তো আমাদের চেয়ে বড়ো।' 'সদ্ভক্তানাং যো ভক্তঃ স যে ভক্ততমো মতঃ'।

স্বামী গিরিজানন্দ বলেন— 'ঠাকুর আপনাদের বড়ো করে গেছেন।' স্বামী প্রেমানন্দজী বললেন : 'তিনি আমাদের বড়ো করেননি, ছোটো করে গেছেন। তোরাও কালক্রমে ছোটো হবি, অহঙ্কারগুলোকে একেবারে মনের ভেতর থেকে তাড়িয়ে দিবি। ঠাকুর বলতেন, আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।'

গিরিশবাবু এক পত্রে স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণনন্দজীকে লেখেন : 'কেহ কেহ আমার নিকট আসিয়া আক্ষেপ করে যে, ঠাকুরের দর্শন পাই নাই। আমি তাহাদের বলি যে, মা গঙ্গা যেমন সগর বংশের উদ্ধারের নিমিত্ত শতমুখী হইয়াছিলেন, ঠাকুরের প্রেমও সেইরূপ ভক্তপ্রণালী দিয়া শতধারে বহিতেছে, জগৎকে পরিত্রাণ দিবে।'

তথ্যমালিকা :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম কথিত।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ।
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।
শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে—স্বামী চেতনানন্দ।

কল্পতরু বর্ণন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি এবং অক্ষয়কুমার সেন

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু হওয়ার দিনক্ষণের বর্ণনা পাওয়া যায় অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'র অন্ত্যলীলায়—

'আঠার শ' ছিয়াশির সাল গণনায়।
বিশেষতঃ দিন ইহা প্রভুর লীলায়।।
প্রথম দিবস আজি নব বরষেতে।
একাদশী তিথি আজি হিন্দুদের মতে।।'

১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি একাদশী তিথিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কল্পতরু হয়েছিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহর। চিকিৎসার প্রয়োজনে কাশীপুরে বসবাস করছিলেন এক বাগান- বাড়িতে। সেদিন ভবনের দ্বিতল থেকে নিম্নতলে নেমে এলেন তিনি, এলেন উদ্যানের পথে।

'গগনে যখন বেলা তৃতীয় প্রহর।
নিম্নতলে নামিলেন কৃপার সাগর।'

ডাক্তারের বিধান অনুযায়ী স্থান পরিবর্তনের জন্য কলকাতার কাশীপুরে আনা হয়েছিল। তা এক বিরাট বাগান, ভিতরে সুন্দর দ্বিতল বাড়ি। চারিদিকে বহু ফুলের গাছ, ফলের গাছ, দুটি পুষ্করিণী, তাতে শানে বাঁধা ঘাট। বাগানের পাশ দিয়ে কোম্পানির বড়ো পথ। মাসে চার কুড়ি টাকা ভাড়া। ঠাকুরেরও পছন্দ হয়েছিল এই বাড়ি। 'পাছু পাছু আসিলেন মাতা ঠাকুরানি'— স্বতন্ত্র মহলে বাসা নিলেন সারদাদেবী, ঠাকুরের ছায়ার মতো সঙ্গ নিলেন ভক্ত-মা। একপাশে পাকশালার বেড়া, মায়ের মহল পূর্বদিকে পৃথক। দ্বিতল বাড়ির দ্বিতলভাগে ঠাকুরের পৃথক আসন, নিম্নতলে রইলেন অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ। তাদের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, কালী, নিত্যরঞ্জন, যোগীন, শরৎ, শশী, বলরাম বসুর শ্যালক বাবুরাম, মুরব্বি গোপাল, তারক ঘোষাল ও লাটু— 'তিয়াগিয়া ঘরবাড়ি একটানে থাকে।/কানেও না শুনে যত আত্মীয়েরা ডাকে।' মাঝে মাঝে ডাক্তার আসেন তাদের মাঝে। চিকিৎসায় 'ঔষধ-বিধানে' ঠাকুরের স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে থাকে, পূর্বাপেক্ষা অঙ্গে বলের সঞ্চার হয়। ঠাকুর মাঝে মাঝে উদ্যানে নেমে এসে বিহার করেন। গোটা বাড়িতে সর্বদা আনন্দের উচ্চরোল, গীতবাদ্যে যেন ফেটে পড়ছে। এই বাগানবাড়িতেই তিনি কল্পতরু হলেন—

'নববর্ষে অপরূপ রূপে পরমেশ।
ভবনে বিরাজমান কল্পতরুবেশ।।'

বাগানে ভ্রমণ করবেন বলে সেদিন উদ্যানের পথে নেমে এলেন 'জগৎ-গোসাঁই', সভক্তে বিহারে বের হলেন। সেদিন তাঁর সাজসজ্জা কেমন ছিল, তার বিবরণ পাওয়া যায়—

'আজি মনোহর বেশ প্রভুর আমার।
বারেক দেখিলে কভু নহে ভুলিবার।।
পরিধান লালপেড়ে সুতার বসন।
গায়ে বনাতের জামা সবুজ বরণ।।
সেই কাপড়ের টুপি কর্ণমূল ঢাকা।
মোজা পায়ে চটি জুতা লতাপাতা আঁকা।।
শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল।
কান্তিরূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল।।'

তবুও দেখা গেল বয়ানেতে নিরন্তর ক্লান্তি; অথচ রূপে সৌন্দর্যের ছটা। অক্ষয়কুমার লিখছেন,

'মনে হয় অঙ্গ-বাস সব দিয়া খুলি।
নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি।'

সেদিন যাঁরা ঠাকুর দর্শন পেয়েছিলেন তাঁদের নাম রয়েছে পুঁথিতে। যেমন হরিশ মুস্তফী (বঙ্গজ-ব্রাহ্মণ, দেবেন্দ্রের মামা), দেবেন্দ্র (তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত), হরিশচন্দ্র, অক্ষয়কুমার সেন নিজে, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নবগোপাল, উপেন্দ্র মজুমদার, রামচন্দ্র, শ্রীহরমোহন, গাঙ্গুলি উপাধিধারী রাঁধুনি ব্রাহ্মণ, প্রতাপচন্দ্র হাজরা, নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্র ডাক্তার (মহেন্দ্রলাল সরকার), রাজেন্দ্র দত্ত (বৌবাজারের সুবিজ্ঞ ডাক্তার) প্রমুখ।

সেবাপর ভক্তরা পিছু পিছু তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সেদিন তাঁর কৃপাসিন্ধু উথলে উঠেছিল। বাগানে উপস্থিত যত দীন দুঃখী, কানা খোঁড়া ছিল, তাদের সবার কথা মনে পড়ে গেল ঠাকুরের, কৃপা করলেন।

ভক্তরা সেদিন ঠাকুরের কাছ থেকে কী পেয়েছিলেন, তার উল্লেখ

আছে পুঁথিতে—

'কৃপা নহে কড়ি পাতি নহে রাজ্যধন।
কিংবা নহে মনোহর কামিনী-কাঞ্চন।।
সুস্বাদু ভোজন নয় নয় গাঁজা সুরা।
নহে মাদকীয় কিছু ক্ষণানন্দধারা।।
তথাপি কৃপার মধ্যে হেন বস্তু আছে।
তুলনায় যাবতীয় রাজ্যধন মিছে।।
কৃপায় আনন্দরাশি বহে শতধার।
ধন্য সে আধার যাহে কৃপার সঞ্চার।।'

সেদিন অক্ষয়কুমার সেন প্রভুর পাদপদ্মে দু'টি জহরিয়া চাঁপা ফুল অর্পণ করেছিলেন,

'দাঁড়াইনু একধারে প্রভুর পশ্চাতে।
জহরিয়া চাঁপা দুটি ছিল দুই হাতে।।...
পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়ে।
তোলা দুটি চাঁপা ফুল দিনু দুটি পায়ে।'

সেদিন অপরাহ্নে অক্ষয়কুমার কয়েকজন ভক্ত, বন্ধু মিলে গাছের উপরে বসে 'বানর বানর' খেলছিলেন। এদিকে গিরিশ ঘোষ জানু পেতে করজোড়ে প্রভুর পদমূলে বসে আছেন। প্রভু পথের উপর সমাধিস্থ।

'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'র লেখক অক্ষয়কুমার সেনকে স্বামী বিবেকানন্দ আদর করে রহস্যপূর্বক 'শাঁকচুন্নি মাস্টার' নামে ডাকতেন। হয়তো তাঁর ঘনকৃষ্ণ বর্ণ, মধ্যমাকৃতি চেহারা এবং রুগ্ন শরীরের জন্যই এই নাম হতে পারে! কলকাতায় ঠাকুরবাড়িতে বালকদের তিনি পড়াতেন, সেখানে তাঁর পরিচয় ছিল 'অক্ষয় মাস্টার'। তাঁরই অক্ষয় কীর্তি 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'। এই পুঁথির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীমা সারদাদেবীর আশীর্বাদও ছিল অক্ষয়কুমারের প্রতি। একবার কামারপুকুরের গ্রামবাসীদের আহ্বান করে এই পুঁথি অক্ষয়কে দিয়ে পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন। এই গ্রন্থ রচনার উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছ থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপর অক্ষয়ের ছিল অপরিসীম বিশ্বাস ও ভক্তি। স্বামীজী চেয়েছিলেন অক্ষয়কুমার যেন ঘরে ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করান। এই পূজার অধিকার ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মেয়ে-পুরুষ সবাই যেন পায়। সত্যযুগে ঠাকুরের প্রেমের বন্যায় সব একাকার হয়ে যাবে। সব ভেদাভেদ উঠে যাবে, আচণ্ডাল প্রেম পাবে, এই ছিল ইচ্ছে। স্বামীজী চেয়েছিলেন 'মহোৎসবে শাঁকচুন্নির পুঁথি সকলের সামনে যেন পড়ে। শাঁকচুন্নি ওই পুঁথি সকলকে শোনাক।' কী কী বিষয় আছে এই পুঁথিতে?

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মকথা; শিবের আবেশ; আপন ঐশ্বর্য প্রদর্শন; রঘুবীরের মালাগ্রহণ; হনুমানের সঙ্গে খেলা; গোচারণ; পাঠশালায় অধ্যয়ন; চিনুশাঁখারীর মিষ্টি ও মালা গ্রহণ; বিশালাক্ষীর আবেশ; পুঁথি-লিখন; কালীপূজা, রমণীর বেশধারণ এবং খেলাচ্ছলে আসন-প্রদর্শন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ আছে কলকাতায় ঠাকুরের আগমন; পুরী প্রতিষ্ঠা, প্রবেশ এবং রানি ও মথুরের সঙ্গে পরিচয়; বিবাহ; তান্ত্রিক-সাধনা; রামাৎ-সাধনা; মথুরকে শিবকালী-রূপ-প্রদর্শন; রাসমণির পরীক্ষা; যোগ-সাধনা, মধুরভাবে সাধনা, ইসলাম-সাধনা, খ্রিস্টান-সাধন; ভাব-প্রদর্শন; স্বদেশ-যাত্রা এবং তীর্থ-পর্যটন।

তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে পেনেটির মহোৎসবে আগমন, কলুটোলায় চৈতন্য-আসন গ্রহণ; হৃদয়ের দুর্গোৎসব, মথুরের দেহত্যাগ; মাতাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন; ষোড়শীপূজা; মধুসূদন দত্তের শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন, ডাকাত বাবার কথা; কেশবচন্দ্রকে কৃপাদান, প্রভুদর্শনে কেশবের দক্ষিণেশ্বরে আগমন, কেশবের শক্তিরূপ-দর্শন, কেশবকে বিশ্বপ্রেমের উপদেশ এবং আত্মপ্রেম প্রদর্শন; লক্ষ্মীমাড়োয়ারীর অর্থদান-প্রার্থনা এবং বহু অন্তরঙ্গের আগমন প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা।

চতুর্থ খণ্ডে রয়েছে প্রভুর সঙ্গে রাখালের মিলন, নিত্যনিরঞ্জনের মিলন; সুরেন্দ্র, মনোমোহন ও রাজেন্দ্রের ঘরে প্রভুর মহোৎসব; নরেন্দ্রের মিলন, মহেন্দ্র মাস্টারের আগমন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথোপকথন, শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে কথা; সিঁথির ব্রাহ্ম সমাজে প্রভুর গমন; নীলকণ্ঠের যাত্রাশ্রবণ; শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশের দর্পচূর্ণ; নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে উৎসব, দেবেন্দ্রের গৃহে উৎসব; ভদ্রকালী গ্রামে প্রভুর আগমন; ভক্তদের সঙ্গে প্রভুর পানিহাটি মহোৎসবে গমন, মাহেশের রথে আগমন বিষয়ক অধ্যায়।

পঞ্চম খণ্ডে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আগমনের কথা; সেখানে বসবাস, সুরেন্দ্রের গৃহে দুর্গাপূজায় তাঁর অলক্ষ্যে আবির্ভাব; মহেন্দ্র ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর রঙ্গ, উপদেশ, ভাবের বাজার প্রদর্শন; তাঁর কালীপূজা; কাশীপুরে স্থান পরিবর্তন, অন্তরঙ্গ-বাছাই, ভক্তদের বাসনাপূরণ এবং তাঁদের নিয়ে মঠস্থাপনের কথা।

অক্ষয়কুমার সেনের জন্ম বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রামে; পিতা হলধর, মাতা বিধুমুখী দেবী। তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারও ঠাকুরবাড়িতে তখন নিযুক্ত। অক্ষয় ঠাকুরের নামে আকৃষ্ট হলেন, তাই তাঁর সামীপ্যে পৌঁছাতে দেবেন্দ্রনাথের সহায়তা পেতে চেষ্টা করলেন। সে সুযোগ একদিন এসে গেল। কাশীপুরে ভক্ত মহিম চক্রবর্তী তাঁর আপন গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ উপলক্ষ্যে এক মহোৎসবের আয়োজন করলে দেবেন্দ্রনাথ সেখানে আমন্ত্রিত হন। তাঁরই সহায়তায় অক্ষয়কুমারও সেখানে যাবার অনুমতি পেলেন এবং প্রভুর লীলাদর্শনে কৃতকৃতার্থ হলেন। কাশীপুরের 'কল্পতরু' দিবসে তিনি সবান্ধব উপস্থিত থেকে ঠাকুরের অসীম কৃপালাভ করেন। ঠাকুর তাঁদের উদ্দেশে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে আশীর্বাদ করেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক'। ঠাকুরের মহাসমাধির দিন তিনি নরেন্দ্রর কথামতো রাতে কাশীপুরে থেকে গিয়েছিলেন। ঠাকুরের লীলাসংবরণের অবস্থা দেখে গভীর রাতে তিনি কলকাতায় গিয়ে গিরিশ ঘোষ ও রামচন্দ্র দত্তকে ডেকে আনেন। একসময় 'বসুমতী' পত্রিকা অফিসে তিনি কাজ করেছেন। শেষ বয়সে নিজের গ্রামের বাড়িতে চলে যান। ১৯২৩ সালের ৭ ডিসেম্বর তিয়াত্তর বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, অক্ষয়কুমার সেন, ষষ্ঠ সংস্করণ মে, ১৯৬১, ২৪তম পুনর্মুদ্রণ, জুলাই, ২০২৩; উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠা-৬১৩-৬১৭।

২. শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মালিকা : অখণ্ড, স্বামী গম্ভীরানন্দ, অখণ্ড সংস্করণের (২০০৫) ১৭তম পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০২৪, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৯২-৫৯৬।

‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্ধশতবর্ষ

মাতৃভূমির বন্দনায় জাতির জাগরণ

ধর্মানন্দ দেব

১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর। বঙ্গীয় সাহিত্য জগতের এক নীরব অথচ ঐতিহাসিক দিন। এদিন সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় একটি গান— যার মাত্র দু'টি শব্দেই নিহিত ছিল এক যুগের জাগরণ, এক জাতির আত্মপরিচয়ের ভাষা— ‘বন্দে মাতরম্।’ আজ দেড় শতাব্দী পর সেই গানটির সার্ধশতবর্ষে দাঁড়িয়ে ভারতের প্রতিটি নাগরিকের হৃদয়ে আবারও ধ্বনিত হচ্ছে— ‘মা, তোমায় বন্দনা করি।’ এই দু'টি শব্দের মধ্যেই যেন গৃহীত হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দীক্ষা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও জাতীয় ঐক্যের চিরন্তন মন্ত্র।

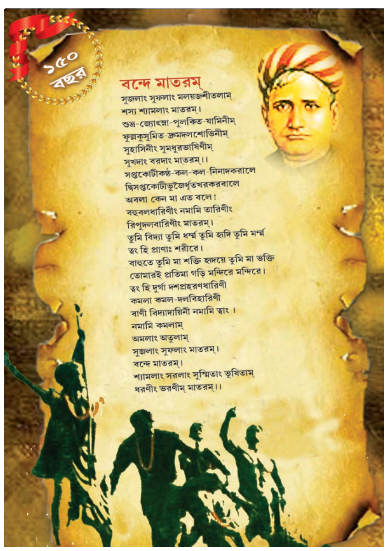

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী থেকে জন্ম নেওয়া এই গানের জন্মকথা শুধুমাত্র একটি সাহিত্যিক সৃষ্টি নয়; এটি এক রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের উদ্‌গম। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের ভারে ক্লিষ্ট জাতি যখন আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলেছিল, তখন ‘বন্দে মাতরম্’ হয়ে উঠেছিল সেই নিঃশব্দ প্রতিরোধের ভাষা, যা একত্র করেছিল ভারতবাসী সকলকেই এক সুরে— মাতৃভূমির বন্দনায়।

গানটির প্রথম প্রকাশ ১৮৭৫ সালে হলেও তার পূর্বপ্রস্তুতি অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে একাধারে কর্মকর্তা ও সাহিত্যিক। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় তিনি তখন কলেজে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষা ও শৃঙ্খলায় আকৃষ্ট তরুণ বঙ্কিম তখনও বুঝে উঠতে পারেননি, হিন্দু জাতি আসলে কোন দাসত্বে বন্দি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেন— ইংরেজ শাসনের তথাকথিত সভ্যতার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক দাসত্বের শৃঙ্খল, যা ভারতীয় জাতিসত্তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মুর্শিদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর পদে কর্মরত অবস্থায় ব্রিটিশ অফিসার কর্নেল ডাফিনের হাতে প্রকাশ্যে অপমানিত হওয়ার ঘটনা তাঁর জীবনে এক গভীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ১৮৭৪ সালে আদালতের নির্দেশে যখন সেই অফিসার ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন— সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে লড়াই মানেই শাসকের ভয় নয়, বরং আত্মসম্মানের জয়। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে ধীরে ধীরে এক জাতীয় চেতনার ধারক করে তোলে।

১৮৭৫ সালের নভেম্বরের ৭ তারিখে বঙ্গদর্শনে যখন প্রথমবারের মতো ‘বন্দে মাতরম্’ প্রকাশিত হয়, তখন হয়তো কেউ ভাবেননি এই গান একদিন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ধ্বনি হয়ে উঠবে। পরে এই গানটি স্থান পায় বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস আনন্দমঠে (১৮৮২)। আনন্দমঠের মূল কাহিনি একদল সন্ন্যাসীকে ঘিরে, যাঁরা মাতৃভূমিকে দেবী রূপে পূজা করেন। তাঁদের চোখে ভারতমাতা কখনও পরম সৌন্দর্যের প্রতীক, কখনও ভগ্নদেহা, আবার ভবিষ্যতে পুনরুজ্জীবিত মহিমায় উজ্জ্বল। শ্রীঅরবিন্দ এই ধারণাকেই ব্যাখ্যা করেছিলেন অগ্নিগর্ভ ভাষায়— ‘তাঁর দৃষ্টিতে মা দ্বিসপ্তকোটি হাতে শাণিত খড়্গ ধারণ করেছিলেন; ভিক্ষুকের দানপাত্র নয়।’ অর্থাৎ ভারতজননী করুণার প্রতীক নন, তিনি শক্তি, তিনি শৌর্য, তিনি সংগ্রামের মূর্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে প্রথমবার এই গানটির সুরারোপ করেন এবং গেয়ে শোনান। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা, রবীন্দ্রনাথের সুর, আর নবজাগ্রত এক জাতির আবেগ— এই তিন মিলিত হয়ে ‘বন্দে মাতরম্’-কে পরিণত করেছিল ভারতীয় জাতীয়তাবোধের প্রথম সংগীতে। তারপর থেকে এটি কেবল গান নয়, এটি হয়ে ওঠে স্বাধীনতা আন্দোলনের মন্ত্র, দেশের প্রতিটি বিপ্লবীর অস্ত্র।

১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট— কলকাতার ঐতিহাসিক টাউন হলে বিদেশি দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণের আহ্বান জানাতে এক সভা হয়। সেই সভায় প্রথমবারের মতো ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। এই দিনটি থেকেই ‘বন্দে মাতরম্’ হয়ে ওঠে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক ধ্বনি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশি আন্দোলনের প্রতিটি পথে, প্রতিটি মিছিলে, প্রতিটি গানেই তখন ধ্বনিত হচ্ছিল এই দুটি শব্দ— যা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ছিল অগ্নিসম প্রতিবাদ।

১৯০৫ সালের নভেম্বরেই রংপুরের এক স্কুলের ২০০ জন ছাত্রকে ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে জরিমানা দিতে হয়েছিল। ১৯০৬ সালে ধুলিয়ায় জনসভায় একই ধ্বনি তুলেছিল সাধারণ মানুষ, আর তার জন্য পুলিশি নির্যাতন নেমে এসেছিল তাদের উপর। কিন্তু ভয় নয়, ত্যাগের আগুনে আরও দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে জাতীয় চেতনার মশাল।

১৯০৬ সালে বরিশালে যখন ১০ হাজার মানুষ ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি দিয়ে পতাকা হাতে শোভাযাত্রা করেন, তখন সেটি ভারতীয় ঐক্যের এক ঐতিহাসিক দৃশ্য হয়ে ওঠে। একই সময়ে বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত

ইংরেজি দৈনিক Bande Mataram কলকাতায় প্রকাশ পেতে শুরু করে, যেখানে যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁদের কলমে এই পত্রিকা হয়ে ওঠে জাতির আত্মমর্যাদার কণ্ঠস্বর, স্বাধীনতার আহ্বানের প্রথম সংবাদপত্র।

১৯০৭ সালের মে মাসে লাহোরে তরুণ বিপ্লবীরা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তুলে রাওয়ালপিণ্ডিতে স্বদেশি নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করেন। পুলিশি অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁদের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়নি। একই বছর বার্লিনের স্টুটগার্টে মাদাম ভিকাজি কামা প্রথম ভারতের বাইরে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন, যার মাঝখানে লেখা ছিল দেবনাগরীতে— 'বন্দে মাতরম্' এটি ছিল ভারতের স্বাধীনতার ভাবনার আন্তর্জাতিক ঘোষণা।

এই গান কেবল ভারতের সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ১৯০৯ সালের ১৭ আগস্ট ইংল্যান্ডে যখন মদনলাল ধিংড়াকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তিনি গলায় দড়ি পরার মুহূর্তে উচ্চারণ করেছিলেন— 'বন্দে মাতরম্'। একই বছর প্যারিসে ভারতীয় বিপ্লবীরা 'বন্দে মাতরম্' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন আর ১৯১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে গোপালকৃষ্ণ গোখলে পৌঁছলে ভারতীয় প্রবাসীরা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে তাঁকে স্বাগত জানান। এ যেন এক বিশ্বময় জাতিসত্তার প্রতিধ্বনি।

১৯০৮ সালের জুনে বম্বে পুলিশ আদালতের বাইরে হাজার হাজার মানুষ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তুলেছিল লোকমান্য তিলকের বিচার চলাকালীন। ১৯১৪ সালে তিলক মুক্তি পাওয়ার পর পুণেতে একই স্লোগানে তাঁকে স্বাগত জানায় জনতা। এই স্লোগান তখন কেবল প্রতিবাদের ভাষা নয়, বিজয়েরও প্রতীক।

একই সময়ে ব্রিটিশ শাসক ভয় পেতে শুরু করে এই গানকে। কারণ, এই দু'টি শব্দ উচ্চারণ করলেই মানুষের চোখে জ্বলে উঠত অদম্য সাহস। তাই নবগঠিত পূর্ববঙ্গের স্কুলে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। কলেজ থেকে বহিষ্কার, চাকরির সুযোগ বাতিল— এসব ভয় দেখিয়ে তারা চেয়েছিল জাতীয় চেতনার আগুন নেভাতে। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' যত নিষিদ্ধ হয়েছে, ততই তার জ্যোতি বেড়েছে।

১৯০৫ সালে হীরালাল সেন ভারতের প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, যার শেষ দৃশ্যে যন্ত্রসংগীত বেজে ওঠে 'বন্দে মাতরম্।' লাহোর থেকে লালা লাজপত রায় 'Bande Mataram' নামে সাময়িকপত্র প্রকাশ করতেন। ব্রিটিশরা যত দমন করেছিল, ততই এই গান হয়ে উঠেছিল প্রতিরোধের জাগরণ।

১৯১০-এর দশকে 'বন্দে মাতরম্' ছেয়ে গিয়েছিল ভারতের প্রতিটি শহর, গ্রাম ও মিছিলে। কবিতা, নাটক, গান, পত্রিকা, পোস্টারে— যেখানেই জাতীয়তার উন্মেষ ঘটেছে, সেখানেই মাতৃবন্দনার এই শব্দবন্ধ আত্মপ্রকাশ করেছে। এমনকী ১৯০৭ সালে শ্রীঅরবিন্দ নিজেও প্রকাশ করেছিলেন Bande Mataram নামক ইংরেজি দৈনিক, যা ছিল ভারতের প্রথম সংগঠিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র।

১৯৫০ সালের ২৪ জানুযারি ভারতের গণপরিষদে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ যখন বলেন— 'বন্দে মাতরম্ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের হৃদয়। জন গণ মন-এর সমমর্যাদায় একে জাতীয় স্তোত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে'— তখন পুরো সংসদ করতালিতে মুখরিত হয়েছিল। এ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যেখানে সাহিত্য, সংগীত ও স্বাধীনতার ত্রিবেণী একত্রিত হয়েছিল ভারতীয় চেতনায়।

২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর এই দিনটিতে জাতি বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি পালন করছে। ভারতজুড়ে চলছে নানা অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, প্রভাতফেরি ও সাংস্কৃতিক উৎসব। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আবারও সুর মেলাচ্ছে এই কালজয়ী গানে, যা একসময় স্বাধীনতার জন্য রক্তে সিক্ত হয়েছিল।

কিন্তু এই উদ্‌যাপন শুধুই অতীতস্মৃতি নয়। 'বন্দে মাতরম্' আজও ভারতের সংবিধানের অন্তর্নিহিত আত্মা— যেখানে মা মানে কেবল ভূমি নয়; ন্যায়, মানবতা ও সহাবস্থানের প্রতীক। যখন সমাজ বিভেদের আগুনে দগ্ধ হয়, তখন এই গান আমাদের মনে করিয়ে দেয়— আমরা এক, আমরা ভারতীয়, আমাদের মা এক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বন্দে মাতরম্'-এর মধ্য দিয়ে যে জাতিচেতনার বীজ বপন করেছিলেন, তা আজও সমগ্র ভারতের মাটিতে বিকশিত হচ্ছে। তিনি দেখিয়েছিলেন, দেশপ্রেম কোনো ধর্ম, বর্ণ বা ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়— এটি এক আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, এক চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধ।

'বন্দে মাতরম্' আমাদের শেখায়— দেশপ্রেম মানে কেবল ভূখণ্ড নয়, বরং সেই আদর্শের প্রতি আনুগত্য, যা আমাদের ন্যায়পরায়ণ করে তোলে, সাহসী করে তোলে, দুর্বলতার বদলে সংগ্রাম শেখায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, 'বন্দে মাতরম্' কেবল একটি স্লোগান নয়, এটি এক যোগসাধনা— যেখানে মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি হলো পরম আরাধনা।

আজ এই সার্ধশতবর্ষে আমাদের কর্তব্য— এই চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটানো। 'বন্দে মাতরম্' যেন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রতিটি ভারতীয়ের কর্মে, চিন্তায়, মূল্যবোধে জীবন্ত হয়ে ওঠে। যে ভারতের বন্দনায় গানটি রচিত হয়েছিল, সেই ভারতের আজও অনেক সন্তান দারিদ্র্য, বৈষম্য, দুর্নীতি ও বিভাজনের শৃঙ্খলে বন্দি। সেই শৃঙ্খল ভাঙার শক্তি নিহিত আছে এই গানেই— যেখানে মাতৃভক্তি মানেই জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, মদনলাল ধিংড়া, ভিখাজি কামা— যাঁরা এই গানকে রক্তে সিঞ্চন ও প্রাণে ধারণ করেছিলেন, তাঁদের আত্মত্যাগের উত্তরসূরি আমরা। তাঁদের পথেই এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।

'বন্দে মাতরম্' আজ শুধু ইতিহাস নয়, এটি এক চলমান দর্শন— যা আমাদের শেখায়, স্বাধীনতা মানে কর্তব্য, ঐক্য মানে ত্যাগ, আর মাতৃভূমি মানে আত্মার উৎস।

আজকের ভারত, যা প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও উন্নয়নের পথে বিশ্বনেতৃত্বের দিকে অগ্রসর, সেই ভারতের চেতনাতেও 'বন্দে মাতরম্' অম্লান। এটি আমাদের স্মরণ করায়— উন্নয়নের অর্থ কেবল পরিকাঠামো নয়, বরং হৃদয়ের পরিশুদ্ধতা, নাগরিকের দায়িত্ববোধ, সমাজের ঐক্য ও ন্যায়ের প্রতি অটল বিশ্বাস।

যদি আমরা আগামী প্রজন্মকে 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রকৃত অর্থ শেখাতে পারি— মাতৃভূমিকে ভালোবাসা মানে তার প্রতিটি মানুষকে ভালোবাসা, প্রতিটি গাছ, নদী, ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মান করা— তবেই এই সার্ধশতবর্ষের উদ্‌যাপন সফল হবে।

আজ, ১৫০ বছর পর, 'বন্দে মাতরম্' আবারও যে নবজন্ম লাভ করেছে। এটি কেবল ইতিহাসের পাতা নয়— এটি আমাদের চেতনার স্থায়ী প্রতীক। আর আমরা, এই যুগের সন্তানরা, কৃতজ্ঞচিত্তে উচ্চারণ করি— বন্দে মাতরম্। মা, তোমায় বন্দনা করি।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ

স্থিতিশীল উন্নয়নের এক শাশ্বত দৃষ্টিভঙ্গি

গীতা (১০।২৬)-তে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'গাছেদের মধ্যে আমি অশ্বত্থ'। যখন আমরা জানব যে একটি গাছের মধ্যেও ঐশ্বরিক সত্তা বিরাজমান, তখন নির্বিচারে বৃক্ষনিধন বন্ধ হবে।

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

একবিংশ শতাব্দীতে মানবজাতি এক ভিন্ন ধরনের অস্তিত্ব রক্ষার সংকটের সম্মুখীন, যাকে আধুনিক যুগের 'কুরুক্ষেত্র' বলা যেতে পারে—তা হলো পরিবেশগত বিপর্যয়। জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের বিনাশ এবং সম্পদের অভাব কেবল প্রযুক্তিগত এবং সরকারি ব্যর্থতা বা উদাসীনতা নয়; এগুলি একটি গভীর আধ্যাত্মিক সংকটের লক্ষণ। আধুনিক বিজ্ঞান কার্বন ফুটপ্রিন্ট বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে কথা বলে, কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই সমস্যার মূলে থাকা মানুষের লোভ এবং প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতার মানসিকতাকে চিহ্নিত করে।

৫ হাজার বছর আগে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী আজও পরিবেশ রক্ষা ও স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। একটু গভীরে অধ্যয়ন করলেই বোঝা যাবে কীভাবে গীতার শিক্ষা আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতির চক্র অনুযায়ী আধুনিক ইকোলজি বা বাস্তুতন্ত্র আমাদের শেখায় যে প্রকৃতির সবকিছু একটি চক্রের মাধ্যমে চলে (যেমন জলচক্র, কার্বনচক্র, নাইট্রোজেন চক্র)। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 'যজ্ঞ'-এর মাধ্যমে এই চক্রকে রক্ষা করার কথা বলেছেন।

'অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।।'(৩।১৪)

সকল প্রাণী অন্ন থেকে জীবন ধারণ করে, অন্ন বৃষ্টি থেকে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি যজ্ঞ সমর্পণ (ত্যাগ ও সৎকর্ম) থেকে হয় এবং যজ্ঞ সমর্পণ ভাব সৎ কর্ম থেকে উৎপন্ন হয়।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রকৃতির পারস্পরিক নির্ভরতার কথা বলেছেন। আমরা প্রকৃতি থেকে যা গ্রহণ করি, তা যদি ফিরিয়ে না দিই (গাছ লাগানো, জল সংরক্ষণ, গোসেবা) তবে সেই চক্র ভেঙে যায়। গীতায় (৩/১২) বলা হয়েছে, যারা দেবতাদের (প্রকৃতির শক্তিসমূহ) থেকে উপহার নিয়ে তাদের পালটা কিছু দান করে না, তারা আসলে চোর (স্তেন এব সঃ)।

এটি আধুনিক 'বৃত্তাকার অর্থনীতি'-এর ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে—নাও-বানাও-ফেলে দাও। কিন্তু বর্তমানে আমাদের এই নীতি বর্জন করে পুনর্ব্যবহার ও পুনর্নবীকরণের পথে হাঁটতে হবে, যা গীতার যজ্ঞচক্রের অনুরূপ।

প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি :

পাশ্চাত্যের শিল্প বিপ্লবের সময় মনে করা হতো প্রকৃতি কেবল মানুষের ভোগের জন্য। কিন্তু গীতা শেখায় যে প্রকৃতি জড় বস্তু নয়, বরং তা ঈশ্বরেরই প্রকাশ। একেই আধুনিক দর্শনে 'ডিপ ইকোলজি' বলা হয়।

''রসোহহম্ অপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।।
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু।।'' শ্লোক (৭।৮ — ৭।৯)

হে কুন্তীপুত্র! আমিই জলের স্বাদ, আমিই চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাব... আমিই পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ এবং আমিই অগ্নির তেজ। আমিই সমস্ত প্রাণীর জীবনশক্তি।

যখন কেউ বিশ্বাস করে যে জল সাধারণ H_2O নয়, বরং তার স্বাদ বা তার সত্তা স্বয়ং ঈশ্বর, তখন সে জল দূষিত করতে দ্বিধা বোধ করবে। মাটি বা পৃথিবী কেবল সম্পদ নয়, তার গন্ধে ঈশ্বরের উপস্থিতি।

পরিবেশ সংরক্ষণ : এই দর্শন মানুষকে প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা

করতে শেখায়। নদী, পর্বত বা অরণ্য রক্ষা করা তখন কেবল 'কর্তব্য' থাকে না, তা 'উপাসনা' হয়ে ওঠে। এটি রাষ্ট্রপুঞ্জের SDG 14 (জলজ জীবন) ও SDG 15 (স্থলজ জীবন) রক্ষার আধ্যাত্মিক ভিত্তি।

সংকটের মূল কারণ :

পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ হলো মানুষের অসীমিত লোভ ও ভোগবাদ। গীতা স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছে যে লোভ মানুষের বিনাশের কারণ।

'ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ।।'(১৬।২১)

অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বার এবং এগুলি নিজেকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। তাই এই তিনটিকে পরিত্যাগ করা উচিত।

লোভ: প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সঞ্চয় করার ইচ্ছা থেকেই জঙ্গল ধ্বংস, খনি খনন এবং প্লাস্টিক দূষণ সৃষ্টি হয়। গীতায় ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে 'যুক্তাহার বিহারস্য' অর্থাৎ পরিমিত আহার ও জীবনযাপনের কথা বলা হয়েছে। আধুনিক যুগে যাকে 'মিনিমালিজম' বা সচেতন ভোগ বলা হয়। গীতা হাজার হাজার বছর আগেই সেই সংযমের শিক্ষা দিয়েছে। প্রকৃত সুখ বস্তুগত সঞ্চয়ে নয়, বরং আত্মতুষ্টিতে নিহিত। অনেকে প্রশ্ন করেন, 'অন্যরা যখন পরিবেশ দূষণ করছে, আমি কেন একা সচেতন হব?' গীতা এর উত্তরে 'লোকসংগ্রহ' বা জনকল্যাণের ধারণা দিয়েছে। (৩।২০)

কর্ম: জনকাদি রাজারা কর্মের মাধ্যমেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাই সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং জগতের মঙ্গলের জন্য তোমার কর্ম পরিবেশ বান্ধব করা উচিত।

মানুষ পৃথিবীর মালিক নয়, আর এই পৃথিবী শুধুমাত্র মানুষেরই বাসভূমি নয়, সে কেবল তত্ত্বাবধায়ক বা Steward। বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখা। একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা আচরণ করেন, সাধারণ মানুষ তাকেই অনুসরণ করে। তাই পরিবেশ রক্ষায় নেতৃত্ববর্গের পথনির্দেশ আমাদের প্রয়োজন। যেমন বিগত বছরে প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত, সমুদ্রের ধারে প্লাস্টিক বর্জ্য জড়ো করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বনাঞ্চলে যাওয়া সব গুলোই প্রেরণাদায়ক।

আধুনিক স্থিতিশীল উন্নয়ন প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা এবং মূল দর্শন প্রজাতির বেঁচে থাকা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, জগতের কল্যাণ আত্মোপলব্ধির মাধ্যমেই সম্ভব।

বিশ্বরূপ ঈশ্বরের সিডিউস, রিইউজ, রিসাইকেল-এর মাধ্যমে প্রকৃতিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার ব্রত নিলে তবেই সাথক।

সংকটের কারণ হিসেবে শিল্পায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কার্বন নিঃসরণ আর এসবের মূল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে লোভ ও অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে (১৫।১) সংসারকে একটি অশ্বত্থ গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখা....)। যদিও এটি একটি রূপক, তবুও ভারতীয় সংস্কৃতিতে গাছপালাকে যে দেবতুল্য সম্মান দেওয়া হয়, তা এখান থেকেই পরিষ্কার। একটি অশ্বত্থ অথবা বট-পাকুড়গাছকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকম ইকোসিস্টেম গড়ে উঠতে পারে। এই শ্রদ্ধাবোধ থেকেই ভারতে প্রাচীনকাল থেকে 'পবিত্র উপবন' রক্ষার প্রথা চলে আসছে, যা আজ জীববৈচিত্র্য রক্ষার অন্যতম মাধ্যম। পশ্চিমবঙ্গ বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড এই বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাশীল। এই স্যাক্রেড গ্রোভস রক্ষায় বিভিন্ন প্রজেক্টে অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে এই সংরক্ষণ কার্য করা হয়ে থাকে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সুদীপ্ত শীল এবং পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের ড. অনির্বাণ রায়, ড. প্রকাশ প্রধানের এই বিষয়ে গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গীতা (১০।২৬)-তে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'গাছেদের মধ্যে আমি অশ্বত্থ'। যখন আমরা জানব যে একটি গাছের মধ্যেও ঐশ্বরিক সত্তা বিরাজমান, তখন নির্বিচারে বৃক্ষনিধন বন্ধ হবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমাদের শেখায় যে পরিবেশ সংকট বাইরের কোনো সমস্যা নয়, এটি আমাদের ভেতরের চেতনা দূষণের প্রতিফলন। নদী পুকুর দূষিত হয়েছে, কারণ আমাদের মন লোভে দূষিত। অরণ্য উজাড় হয়েছে, কারণ আমরা আধ্যাত্মিকতা হারিয়েছি।

স্থিতিশীল উন্নয়ন কেবল বাহ্যিক নীতি বা আইন দিয়ে সফল হতে পারে না, এর জন্য প্রয়োজন 'কর্মযোগ'।

নিষ্কাম কর্ম : ফলাফলের আশা না করে পরিবেশ রক্ষায় ব্রতী হওয়া।

সর্বত্র সমদর্শন : সকল জীবের মধ্যে আত্মাকে দেখা, 'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং সহ যোগী পরমো মতঃ'।। (৬।৩২) হে অর্জুন, যিনি নিজের (আত্মার) সঙ্গে তুলনা করে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সমতা দেখেন, অর্থাৎ অন্য জীবের সুখ বা দুঃখকে নিজের সুখ বা দুঃখের অনুরূপ মনে করেন, আমার মতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। এই ভাব জীবজন্তুর প্রতি অহিংসার জন্ম দেয়।

সংযম : নিজের প্রয়োজন কমিয়ে প্রকৃতির ওপর চাপ কমানো।

আমরা যদি 'ইগো-সেন্ট্রিক' (মানুষই সর্বেসর্বা) ভাবনা থেকে বেরিয়ে 'ইকো-সেন্ট্রিক' (প্রকৃতি ও ঈশ্বর এক) ভাবনায় উন্নীত হতে পারি, তবেই পৃথিবী রক্ষা পাবে। এই পরিবেশ ভাবনা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে পরিবেশ সংরক্ষণের কাজ চলছে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে। জল সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, প্লাস্টিক বর্জনের কাজ আগামীদিনে আমাদের পরিবেশ রক্ষার কাণ্ডারি হয়ে উঠবে। আজকে জাতি-ধর্ম-কর্ম নির্বিশেষে মতাদর্শ যাই হোক সহমত হন বা নাই হন, পরিবেশ না বাঁচলে আপনার জাতি-ধর্ম-কর্ম-মত-আদর্শ-দল-নীতি কিছুই বাঁচবে না। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। ঠিক তেমনই এক পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যতীত সৃষ্টি রক্ষার দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (৪।১১)

এর অর্থ, 'যে ব্যক্তি আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেভাবেই কৃপা করি'। ঠিক আমরা যেমন ভাবে পরিবেশের সেবা করব অথবা ক্ষতি করব সেভাবেই আমাদের ফল প্রাপ্তি হবে। 'অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে'—এই গভীর দার্শনিক শ্লোকের মূল ভাব হলো, সমগ্র সৃষ্টি সেই পরম সত্তা (ঈশ্বরের) থেকে উদ্ভূত। এই সৃষ্টির প্রতিটি উপাদান, তা সে নদী হোক, বন হোক বা প্রাণী—সবকিছুই সেই পরমেশ্বরের অংশ।

'অহম্ সর্বস্য প্রভব' : স্রষ্টার সৃষ্টিকে রক্ষা করি, প্রকৃতিকে সম্মান করি।

'মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে' : প্রতিটি জীবন তাঁর দান, প্রকৃতি রক্ষাই হোক আমাদের প্রাণ।

অর্থাৎ, প্রকৃতির ক্ষতি করা মানে স্রষ্টারই ক্ষতি করা। গীতার বাণী মনে রেখে, প্রকৃতিকে দিই ভালোবেসে। তাঁর সৃষ্টি, তাঁরই অংশ রক্ষা করাই পরম ধর্ম। □

রাজনৈতিক চাপে পিষ্ট বিএলও-রা

অজয় ভট্টাচার্য

রাজনৈতিক দল, নেতা ও ব্যবস্থার নৈতিক ও আদর্শগত অবক্ষয় ঘটলে রাজনীতি কোন স্তরে পৌঁছতে পারে, তার সাক্ষী থেকে যাচ্ছে বর্তমান সময়। মানুষের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি কাম্য নয়। অথচ সেটাই এ রাজ্যের নতুন বাস্তবতা। অস্বাভাবিক মৃত্যু একটি অমানবিক ঘটনা। একে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলে মানবিক মূল্যবোধকেই আঘাত করা হয়। রাজনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সত্য উদ্ঘাটন ও জনগণের কল্যাণ। কিন্তু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিভাজন, দোষারোপ বা জনমোহিনী প্রচার শুরু করলে প্রকৃত সত্য আড়ালে চলে যায়। আসলে রাজ্যের মূল সমস্যাগুলি থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য নতুন হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এসআইআর। পশ্চিমবঙ্গ-সহ যে ১২টি রাজ্যে এসআইআর শুরু হয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই এসআইআর নিয়ে যত আপত্তি, বিরোধিতা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একে বিতর্কিত করে তুলেছেন। অন্য রাজ্যগুলিতে এসআইআর কেবল একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এটি রাজনৈতিক বিতর্কের রূপ নিয়েছে। সুষ্ঠু গণতন্ত্রের স্বার্থে এসআইআর-এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ভোটার তালিকা ত্রুটিপূর্ণ রেখে কখনোই সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন করা যায় না।

সেক্ষেত্রে ভোটের ফলাফলেও বিকৃতি ঘটার আশঙ্কা থাকে। এতে গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়। ভোটার তালিকার ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ দেয় এসআইআর। তাই এটি কেবল প্রশাসনিক কাজ নয়, নাগরিক অধিকার রক্ষারও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে ভোট দিতে পারে এবং কেউ যাতে অন্যায়ভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ না পায়— সেটাই নিশ্চিত করে এসআইআর। তবুও এসআইআর নিয়ে বিরোধিতা আসলে দুর্নীতি, বেকারত্ব, চরম প্রশাসনিক অনিয়ম, শিক্ষায় অস্থিরতা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনতি— এসব থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা। ভোটার তালিকা

সংশোধনের মতো স্বাভাবিক কাজের মধ্যেও ষড়যন্ত্র, মৃত্যু বা বৈষম্যের অভিযোগ তুলে জনমত প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে— যাতে গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে যায়। কারণ অরাজকতার মধ্যেই নিহিত থাকে এক শ্রেণীর মানুষের ক্ষমতার চাবিকাঠি।

তবে তৃণমূল মুখে এসআইআর-এর নামে বিরোধিতা সপ্তমে চড়িয়ে রাখলেও দলের নেতা কর্মীদের মাঠে নামিয়ে দিয়েছে যাতে এসআইআর থেকে যথাসম্ভব সুবিধা ঘরে তুলে আনা যায়। যে কারণে অনেক জায়গায় বিএলও-দের পিছনে ঝান্ডা হাতে তৃণমূলের কর্মীদেরও দেখা যাচ্ছে। ইনিউমারেশন ফর্ম বিলিতে বিএলও-দের কাজে হস্তক্ষেপ করছে তৃণমূল কর্মীরা বলে অভিযোগ উঠেছে। যাঁদের নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল, সেই সব ক্ষেত্রেও শাসক দল একতরফা ফর্ম পূরণ করছে, এমন অভিযোগও সামনে এসেছে। প্রসঙ্গত, এসআইআর নির্বাচন কমিশন পরিচালনা করলেও তাদের নিজস্ব কর্মী নেই। রাজ্য সরকারের কর্মীদের উপর নির্ভর করতে হয় কমিশনকে। অভিযোগ, এসআইআর-এ যুক্ত রাজ্য সরকারের কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শাসক দলের পরামর্শদাতা সংস্থার টিম। তাই এসআইআর-এর উদ্দেশ্য কতদূর ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। এই সত্য বুঝতে পেরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, 'এই রাজ্য সরকারকে ক্ষমতায় রেখে প্রকৃত এসআইআর সম্ভব নয়'।

আবার বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা সজাগ থেকে যে শাসক দলের কৌশলকে পর্যুদস্ত করবেন সেটাও সর্বাংশে সম্ভব নয়। কারণ সন্ত্রাসের ভয়ে তারা কর্মীরা প্রকাশ্যে আসতে ভয় পাচ্ছেন। শাসক দলের 'সন্ত্রাস' ও চিহ্নিত হওয়ার ভয়েই এই অবস্থা বলে বিজেপির অভিযোগ। শুধু তাই নয়, কমিশন নিজেই অভিযোগ করেছে যে, 'কাজের চাপ নয়, বিএলও-দের মৃত্যুর পিছনে আসলে শাসক দলের কর্মীদের রাজনৈতিক চাপই দায়ী। রাজ্য সরকারি কর্মী হওয়ার ফলে যে চাপ বিএলও-দের উপরে নিরন্তর দিয়ে চলেছে শাসক দলের কর্মীরা, সেই চাপ দায়ী'। কমিশন সূত্রে খবর, মৃত ভোটার, পরিযায়ী ও দু'জায়গায় উপস্থিতি রয়েছে এমন ভোটারদের নাম রেখে দিতে শাসক দলের নেতারা বিএলও-দের নিরন্তর চাপ দিচ্ছেন— যা অনুচিত। তাই রাজনৈতিক দলের কর্মীরা যাতে বিএলওদের মানসিক চাপ ও ভয় না দেখান, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে। এমনকী বিএলওদের পারিশ্রমিক এখনো কেন রাজ্য দেয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কমিশন অবিলম্বে ওই পারিশ্রমিক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যকে।

তাছাড়া, রাজ্যকে স্থায়ী ডেটা এন্ট্রি অপারেটর দেওয়ার যে সুপারিশ করেছিল কমিশন, তাতেও সায় মেলেনি রাজ্যের। যার ফলে কাজের চাপ আরও বেড়েছে। তাই সবমিলিয়ে বিএলওদের উপর যে অমানুষিক চাপ, তার জন্য দায়ী রাজ্য সরকার নিজেই।

কিশোর গল্প

টিংকুর মন খারাপ

সকালবেলা মন খারাপ হয়ে গেল টিংকুর।

একটু আগে ওরা চলে গেল। তিন-চারটে লোক পুকুর,বাগান মাপজোক করে চলে গেল। শিউলিগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ওরা কীসব কথা বলছিল আর সিগারেট খাচ্ছিল। ধোঁয়ায় শিউলিগাছটার কষ্ট হচ্ছিল না! ওরা কি ভেবেছে সে কথা?

লোকগুলো চলে গেলে টিংকু আবার বারান্দায় চলে এল। বারান্দা থেকে দেখা যায় পুকুরটা। বড়ো শান্ত পুকুর। শ্যাওলা ভেসে থাকে। তার মধ্যে ফুটে থাকে নানা জলপদ্ম। কী সুন্দর লাগে হাঁসগুলো যখন সাঁতার কাটে। ওদের ডুব দিয়ে শামুক খাওয়া টিংকুর দেখতে খুব ভালো লাগে। মনে হয় কেন সে হাঁস হলো না।

মা-বাবা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফাঁকা পেলে মোবাইলে ডুবে যায়। টিংকুর এতটুকু ভালো লাগে না ওই যন্ত্রটাকে। সে বারান্দায় বসে বাগান দেখে। কত পাখি আসে। নানা স্বরে ডাকে। যেন কোনো পাখির মেলা। টিংকুর মন সেই ডাক শুনে পাখিদের দেশে চলে যায়। সে আরও অবাক হয়, পাখিদের গায়ে নানা রঙের আলপনা দেখে। যেন তার স্কুলের ড্রয়িং স্যার এঁকে দিয়েছেন। কী সুন্দর রঙের ম্যাচিং। গাছের ডালে বসে পাখিগুলো অস্থির চোখে এদিক-ওদিক তাকায়। যেন টিংকুকে খুঁজছে। কিন্তু পুকুরপাড়ে যাওয়া মা'র বারণ।

—টিংকু।

ডাক শুনে ভেতরে আসে সে। চৈতি বলে, স্নানে যাও। স্কুল যেতে হবে তো?

—আজ স্কুলে যাবো না।

—কেন?

—মন খারাপ।

— কী হয়েছে?

—মা, এই পুকুরটা আর থাকছে না। এখানে ফ্ল্যাট বাড়ি উঠবে।

—কে বলল তোমোকে?

—একটু আগে কারা সব মাপজোক করে গেল। আমি আর পুকুর দেখতে পাবো না। হাঁসের সাঁতার আর দেখতে পাবো না। পাখিরা আর আসবে না। ওরা আমাকে ডাকবে না।

—আমাদের তো কিছু করার নেই।

—কিন্তু বড়ো জেঠার মেয়ে পিংকিদিদির বিয়েতে এই পুকুরকে নিমন্ত্রণ করেছিলে। আমার দিদির বিয়েতে কাকে নিমন্ত্রণ করবে মা?

ছেলের এই কথায় চৈতি কোনো উত্তর দিতে পারল না। বুঝতে পারল দক্ষিণের হাওয়া আর বেডরুমে আসবে না।

দেবদাস কুণ্ডু

জাতীয় উদ্যান

সিম্বলবারা

সিম্বলবারা জাতীয় উদ্যান হিমাচল প্রদেশের সিরমোর জেলার কিয়ারদা দুন উপত্যকায় অবস্থিত। এটি শের জং জাতীয় উদ্যান নামেও পরিচিত। এটির আয়তন ২৭.৮৮ বর্গকিলোমিটার। উদ্যানে একটি ঝরনাও রয়েছে। এই উদ্যানে শালগাছের আধিক্য রয়েছে। বন্যপ্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাঘ, চিতাবাঘ, কাকর হরিণ, কালো ভালুক প্রভৃতি। এই অভয়ারণ্য পরিদর্শনের জন্য সেরা সময় হলো এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাস। বর্ষাকালে ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য ভূমিধসে রাস্তাঘাট বন্ধ থাকে। এই উদ্যানের মিশ্র পর্ণমোচী বন এবং তৃণভূমি প্রকৃতিপ্রেমী ও বমপ্রাণী পর্যবেক্ষকদের আকর্ষণের কেন্দ্র।

এসো সংস্কৃত শিখি-৯৪

বামত: (বামদিকে)

শিক্ষকস্য বামত: রমেশ: অস্তি।
শিক্ষকের বাঁদিকে রমেশ আছে।

অভ্যাসং কুর্ম: –
শয্যায়া: বামত: আসন্দ: রমেশ:।
বিদ্যালয়স্য বামত: উদ্যানম্ অস্তি।
শিবস্য বামত: পার্বতী অস্তি।

প্রয়োগং কুর্ম: –
'**বামত:**' দ্বারা বাক্যাণি রচযাম:।

ভালো কথা

পাড়ার কুকুর

কদিন থেকে যা শীত পড়েছে তা বলার নয়। পাড়ার সব কুকুর সন্ধ্যার আগেই আমাদের বাড়িতে চলে আসছে। আমার ঠাকুমা আবার সেগুলোকে গোয়লঘরের পাশে খড়ের গাদায় থাকার জায়গা করে দিয়েছে। রাত্রিবেলা কুকুরগুলোকে চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখে। দুপুরে চালের খুদের ভাত রান্না করে খেতে দেয়। ঠাকুমা নিজেই রান্না করে। মা একদিন এই সবের জন্য বাবার কাছে অভিযোগ করেছে। ঠাকুমা শুনতে পেয়ে বলেছে, সব বাড়িতে তো যায় না, আমাদের বাড়িতেই কেন আসে একবার ভেবে দেখ। একথা শুনে মা চুপ করে গেছে।

শিউলি মহান্তি,অষ্টমশ্রেণী,বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

বাড়ি ফিরে

রিদ্ধিমা শাসমল, অষ্টমশ্রেণী, আরামবাগ, হুগলী

যাচ্ছি আমি ট্রেনে চেপে
দূর বহু দূর দেশে,
আনন্দ আর কৌতূহলে
স্বপ্নভেলায় ভেসে।
স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে বেগে
ট্রেনটা নিজের মত,
গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে
ছুটছে অবিরত।
নাম না জানা অনেক পাখি
দেখছি জানালা দিয়ে,
বলবো মাকে এসব কথা
বাড়ি ফিরে এসে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

আমার স্মৃতিতে সঙ্ঘ-পরিক্রমা

অরুণ কুমার মহন্ত

সময়ের ব্যাবধানে অনেক কথাই স্মৃতিতে ধূসর হয় বা একেবারেই মুছে যায়। সঙ্ঘের বিষয়ে মনের মধ্যে বহু মুখ যেমন ভেসে ওঠে, তেমনই অসংখ্য ঘটনার ঘনঘটা মনকে বড়ো অস্থির করে তোলে। সাল তারিখের আর হিসেব থাকে না। কোনটা আগের আর কোনটা পরের ঘটনা তার ক্রমবদ্ধ মালা গাঁথা এখন বড়োই মুশকিল।

আমি ১৯৬৮ সালে স্বয়ংসেবক হই। সেবছর জলপাইগুড়ির বন্যায় বালুরঘাটের আশে পাশের বহু জায়গায় তার প্রকোপ পড়ায় বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক আশিস গাঙ্গুলি ও তাঁর কয়েকজন একান্ত পরিচিত মাস্টারমশাইয়ের উদ্যোগে বন্যায় সেবাকাজের তোড়জোর চলছিল। সেই আবহে মালদহ জেলা থেকে কয়েকজনকে তৎকালীন সঙ্ঘ প্রচারক বংশীদা (বংশীলাল সোনী) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় সঙ্ঘকাজের জন্য নিয়ে এলেন। তার মধ্যে বালুরঘাট, পতিরাম ও হিলিতে যথাক্রমে সুভাষ দাস (কর্মজীবনে এস বি আই ব্যাংকে উচ্চপদে চাকুরি করে অবসর নেন), সুশীল সরকার (কর্মজীবনে শিক্ষক) ও গোপেশ ঘোষ (কর্মজীবনে এডিএম হয়ে অবসর নেন)-কে সঙ্ঘের শাখা শুরু করার দায়িত্ব দেন। বালুরঘাটে বন্যার কারণে পতিরামের প্রায় ১৫ দিন পরে শাখা শুরু হয়েছিল।

ওই বছর আমি বালুরঘাটের জয়চাঁদ লাল প্রগতি বিদ্যাচক্রের (জে.এল.পি.বিদ্যাচক্র) নবম শ্রেণীর ছাত্র। বিকেলে কয়েকজন সহপাঠী ও পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত মাঠে শরীরচর্চা, খেলাধুলা বিশেষ করে ফুটবল খেলা পুরোদস্তুর চলছিল। একদিন আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাই নকুলেশ্বর মজুমদার (পণ্ডিতবাবু) আমাদের কয়েকজনকে ডেকে আশিস গাঙ্গুলির বাড়িতে আসতে বললেন। পরদিন বিকেলে আমরা কয়েকজন বন্ধু যাদের মধ্যে গোবিন্দ ব্যানার্জি, মধুসূদন ঘোষ, অমলেন্দু মজুমদার, জীবন কুমার দত্ত ও স্বপন কুমার সাহা (বর্তমানে কলকাতায় সন্তোষপুরের বাসিন্দা) আশিস গাঙ্গুলির বাড়িতে এলাম। সেখানে মালদা থেকে আসা সুভাষ দাসের সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি প্রস্তাব দিলেন 'চল সবাই খোলার মাঠে যাই।' তখন মাঠটি সদু মোক্তারের মাঠ বলে পরিচিত ছিল। এখন আর সেখানে মাঠ নেই , বাড়িঘরে পূর্ণ। সেখানে গিয়ে সুভাষদা পকেট থেকে এক ঠোঙ্গা বাদামভাজা বের করে সবাইকে গোল করে বসিয়ে মাঝখানে রেখে খেতে খেতে কে কোন পাড়ায় থাকি ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলেন। বাদামভাজা মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হলো। এদিকে সন্ধ্যাও প্রায় হয়ে এসেছে। আমাদেরও বাড়ি ফেরার তাড়া। সুভাষদা ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন আমরা সবাই ফুটবল, ক্রিকেট খেলার সঙ্গে সঙ্গে আসন ও ফ্রিহ্যান্ড এক্সারসাইজও করি। তিনি তখন বললেন আগামীকাল তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বিকেল ৪টায় মাঠে এস। অনেক রকমের খেলা ও আসন করব আমরা।

তখন দুর্গাপূজার ছুটি চলছে। আমরা নির্দিষ্ট সময়ে বিকেলে মঠে পৌঁছে দেখি সুভাষদা আগেই উপস্থিত। সেদিন কিছু খালিহাতে ব্যায়াম ও ২/১টা সহজ আসন হলো। তারপর সুভাষদা গান করালেন 'হিন্দু মোর ভাই হিন্দু মোরা'। তারপর প্রার্থনার প্রথম স্তবক গাওয়া হলে। শেষে 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি দিয়ে সেদিনের কার্যক্রম শেষ হলো। পরে জানলাম এই দিনেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা শুরু হলো। উদ্দেশ্য হিন্দু সংগঠন। শুধু এইটুকুই জানলাম। পরদিন আমাদের সকাল

ফঃ ৬

১০/১১ টা নাগাদ আবার আশিসদার বাড়িতে আসতে বলা হলো ডাঙ্গীতে বন্যাত্রাণে যাওয়ার জন্য। আমাদের নিয়ে বালুরঘাটের দক্ষিণদিকে পূর্ববঙ্গ সীমান্তের গ্রাম ডাঙ্গীতে যাওয়া হলো। কলকাতার বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির পাঠানো প্রচুর জামাকাপড় বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণ করা হলো। এই কাজে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন আশিস গাঙ্গুলি ও পতিরামের বিশ্বনাথ পাল ও আরও কয়েকজন।

তার পরদিন থেকে নিয়মিত শাখা চলতে থাকল। পূজার ছুটি শেষ হয়ে এল। সুভাষদা মালদা ফেরার আগের দিন আমাকে শাখার মুখ্য শিক্ষক ঘোষণা করে দিলেন। কয়েকদিন আশিসদার তত্ত্বাবধানে শাখা বেশ ভালোই চলছিল। পাড়ার উৎসুক মানুষজন আমাদের খেলাধুলা দেখে আশিসদার সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করছিলেন এখানে কী হচ্ছে। আশিসদা কী উত্তর দিয়েছিলেন মনে নেই। কিন্তু আশিসদার তত্ত্বাবধানে নিয়মিত শাখা চলতে থাকল। দিনে দিনে স্বয়ংসেবকদের সংখ্যাও বাড়তে থাকল। আমাদের স্কুলের দু'জন মাস্টারমশাই তখন শাখায় আসতে শুরু করলেন। তার মধ্যে একজন প্রভাত কুমার নন্দী ও অন্যজন তপন কুমার চ্যাটার্জি। ইতিমধ্যে বাকুড়া থেকে অবনীভূষণ মণ্ডল বালুরঘাটে প্রচারক হয়ে আসেন। অবনীদা তাঁর স্কুল থেকে ২ বছরের ছুটি নিয়ে প্রচারক বের হয়েছিলেন। তাঁর সময় শেষ হলে ১৯৭১সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় বালুরঘাটের প্রচারক হয়ে এলেন আসনসোলের সুনীল ভট্টাচার্য। সে সময় বালুরঘাটে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শাখায় আসতে শুরু করলেন। নিত্য শাখায় খেলাধুলার মাঝে ভারতমাতা কী জয়, শিবাজী মহারাজ কী জয়, গুরু গোবিন্দ সিংহ কী জয়, মহারাণা প্রতাপ কী জয়, হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ প্রভৃতি ধ্বনিতে শাখার মাঠ মুখরিত হয়ে উঠত। প্রার্থনার আগে গোল করে বসে স্বয়ংসেবকদের খোঁজখবর এবং মহাপুরুষদের জীবনী থেকে, ইতিহাসের ছোটো ছোটো প্রেরণাদায়ী ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলত। এগুলি মনকে খুব নাড়া দিত। শাখায় এমন উৎসাহ এল যে কাবাড়ি খেলায় আশিসদা, তপন দা, প্রভাতদাও অংশ নেওয়া শুরু করলেন। অবনীদা আগেই সকলের অবনীদা হয়েছিলেন, আর কখন যে আমাদের শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইরাও সকলের দাদা হয়ে গেলেন তা এখন আর মনে করা সম্ভব নয়। যেন সকল স্বয়ংসেবক একই পরিবারের সদস্য। যেহেতু আশিসদার বাড়িতে সব প্রচারকেরা উঠতেন এবং আমাদেরও সময়ে অসময়ে যাতায়াত শুরু হলো, তাই আশিসদার বাড়িই হয়ে গেল অলিখিত সঙ্ঘ কার্যালয়। বংশীদা বালুরঘাটে এলে ওখানেই উঠতেন এবং অন্য প্রচারকের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতেন। আশিসদার মা সকলের 'মাসিমা' হয়ে গেলেন, তিনি স্বহস্তে রান্না করে প্রচারকদের খাওয়াতেন।

তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সঙ্ঘচালক শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই (কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী) আমাদের শাখায় একদিন উপস্থিত হলেন। পূর্ব সূচনা অনুসারে শাখায় খুব ভালো সংখ্যা ছিল। আমি দণ্ডের কালাংশে ক্রমশঃ ও দ্বি-বারম্ কুরুতে একই আজ্ঞা দিয়ে শেষ করলাম। পরে মাস্টারমশাই মন্তব্য করেছিলেন দণ্ড ভালোই হয়েছে কিন্তু তুমি ক্রমশঃ ও কুরুতে একই আজ্ঞা দিলে কেন? ওই শিক্ষা আমি এখনও ভুলিনি।

জেলাতে সঙ্ঘকাজের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রবিরোধী মানুষের বিরোধিতা বাড়ছিল। একদিন এসএফআই-এর ছেলেরা মোক্তারপাড়া শাখায় হামলা করল। স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে মারপিট হলো। আমি প্রতিশোধের অনুমতি না দেওয়াতে আমার সহপাঠী স্বয়ংসেবক অসীম সরকার তো শাখাই ছেড়ে দিল।

প্রচারকের দায়িত্ব নিয়ে যে সকল প্রচারক বালুরঘাটে কাজ করেছেন এবং সকলের বিশ্বাস ও অফুরন্ত শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে অবনীভূষণ মণ্ডল,বিশ্বনাথ বিশ্বাস, বিজয়গণেশ কুলকার্ণী, কে রঙ্গনাথন (রাঙ্গাদা), ডাঃ সনৎকুমার বসুমল্লিক, প্রদীপ দে, বিজন বর্মন, পার্থ ঘোষ, সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী, প্রদীপ পাল, গৌরাঙ্গ দাস ও মলয় দত্ত অন্যতম। জীবন গঠনে যে সমস্ত প্রচারকের আমি বিশেষ স্নেহভাজন ছিলাম তাঁরা হলেন বংশীদা, দেবুদা, রাধাগোবিন্দদা ও শ্যামলালদা। এদের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ।

সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে, বিভিন্ন স্থানে যে সকল পথ প্রদর্শক প্রচারকের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁদের মধ্যে একনাথ রাণাডে—যাঁর সংকলন গ্রন্থ 'স্বামীজার হিন্দুরাষ্ট্রচিন্তা' পড়ার সুযোগ হয়েছে। শিলিগুড়িতে বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিষয়ে তাঁর যে বৈঠক হয়েছিল শিলিগুড়ি কলেজের শিক্ষক শিক্ষণ কক্ষে তাতে বহু অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। অনন্তলাল সোনী (যাঁকে চায়ে অর্ধেক কাপ চিনি, বেশি পরিমাণ দুধ দিয়ে বানিয়ে দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল); মাধব রাও বনহাট্টি (যিনি সত্যিকারের শিক্ষকদের শিক্ষক ছিলেন। সঙ্ঘকাজে তিনি ভারতের বাইরে 'মারিচ দেশে' বর্তমান নাম মরিশাসে গেলে তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করেছি। উত্তরে ওখানকার কাজ এবং মনমোহনদা ও বিমলকৃষ্ণ দাসের কথা উল্লেখ করেছেন; ভাউরাওজী, যাদবরাও যোশী, কৃষ্ণচন্দ্র গান্ধী, লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, যাঁর কথা বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গ কোনোদিনই ভুলতে পারবে না; সুনীলপদ গোস্বামী, অদ্বৈতচরণ দত্ত, সুধাময় দত্ত, সর্বোপরি কেশবজী ছিলেন সকলের অভিভাবক।

সঙ্ঘ প্রবেশের পর থেকে পরমপূজনীয় শ্রীগুরুজী, শ্রীবালাসাহেব দেওরসজী, অধ্যাপক শ্রী রাজেন্দ্র সিংহ (রজ্জু ভাইয়া), শ্রীকুপ্পহল্লী সীতারামাহয়ী সুদর্শন (সুদর্শনজী) এবং বর্তমান সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতজীর উপস্থিতিতে যে সকল কার্যক্রমে উপস্থিত হয়ে তাঁদের বৌদ্ধিক শুনেছি—আজ সাল, তারিখ কিছুই মনে নেই।

১৯৬৮ সালের পূজার ছুটির শেষ দিকে মালদার চাঁচলে সঙ্ঘের ৩ দিনের শীলকালীন শিবিরে গিয়েছিলাম। এই শিবিরই আমার প্রথম সঙ্ঘশিবির। এই শিবিরে মুখ্য শিক্ষক ছিলেন অলোকদা। সেখানেই প্রথম পরিচয় হয়েছিল কলিগ্রামের মিহির গোস্বামী, সুভাষ গোস্বামী, অশেষ গোস্বামীদের সঙ্গে। কলিগ্রামের রসগোল্লা, চাঁচলের অনেক প্রকারের দইয়ের কথা ভোলার নয়। ১৯৬৯ সালে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর বৌদ্ধিক শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। পশ্চিম দিনাজপুর থেকে বেশ কয়েকজন ওই বর্গে গিয়েছিলাম। তার মধ্যে মদনগোপাল টুডু ও প্রদীপ সাহা ছাড়া অন্য মুখগুলি মনে ভাসলেও নাম স্মৃতিতে নেই। ওই বর্গের সমাপন কার্যক্রমে মাঠে শ্রীগুরুজীর ভাষণ শোনার জন্য শারীরিক প্রদর্শনের পর 'উপবিশ' আজ্ঞা হলো। আমাদের সঙ্গে অতিথিরাও নিজ নিজ আসনে বসে পড়লেন। হঠাৎ কালবৈশাখীর কালো মেঘে আকাশ ঢেকে গেল। প্রবল ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হলো। শ্রীগুরুজীর ভাষণ সবে শুরু হয়েছে। কোনো কার্যকর্তা শ্রীগুরুজীর

মাথায় ছাতা ধরার চেষ্টা করলেন। শ্রীগুরুজী হাত নাড়িয়ে তাকে নিষেধ করলেন। পুরো একঘণ্টা শ্রীগুরুজীর ভাষণ হলো। মাঠের একটু নীচু জায়গায় আমরা যারা বসেছিলাম তাদের প্রায় কোমর পর্যন্ত জলে ডুবে গেল। সঙ্ঘের অনুশাসনের কথা মনে করে মাঠের কোনো স্বয়ংসেবক যখন কোনো প্রতিক্রিয়া করল না তখন সঙ্ঘের অনুশাসন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ অতিথিরাও কেউ তাঁদের স্থান ছেড়ে যাননি। গণবেশের কালোটুপির জল সাদা জামায় পড়ে কালো দাগ পড়ে গেল। সেই সময়ের লোহার নাল লাগানো ভারী বুট জুতো, মোজার সঙ্গে প্রায় ১ গজের লম্বা পুংলি পট্টি জলে ভিজে বেশ মজার অবস্থা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে বেশ কয়েক জায়গায় বংশীদার আদেশে বিস্তারক থাকার সুযোগ হয়েছিল। পরের বছর ১৯৭০ সালে শিলিগুড়িতে দ্বিতীয়বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ করলাম। তখন বালুরঘাটের আশেপাশে বেশ কয়েকটি শাখা শুরু হয়েছে। কুমারগঞ্জের চুড়লকৃষ্ণপুর, বেলতাড়া, পতিরাম, বালুরঘাটের কুড়মাইল, মুরারীপুর এবং চকরামপ্রসাদ গ্রামে খুব ভালো শাখা চলছিল। আমার সহপাঠী চুড়কা মুর্মু তখন চকরাম প্রসাদ গ্রামের শাখার মুখ্য শিক্ষক। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে একদিন ভোরবেলায় পাকসেনারা ভারত ভূখণ্ডে ঢোকার খবর শোনায় চুড়কা কাছের বিএসএফ ক্যাম্পে খবর দেয়। ক্যাম্পে জোয়ানদের সংখ্যা কম থাকায় চুড়কাই প্রায় ৩০ কেজি ওজনের গুলির বাক্স বহন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। চকবলিরাম গ্রামের এক পুকুরের পাশে পৌছানোর পর পরই খানসেনারা ভারতীয় ৪ জন বিএসএফ জোয়ানকে ঘিরে ফেলে। গুলির বাক্স খানসেনাদের হাতে না পড়ে সেই ভেবে পাশের পুকুরে ফেলতে যায়। বর্ষাকালের জন্য মাঠঘাট পিচ্ছিল, পুকুরের জলের পাশে পাটের চাষ থাকায় জলের কাছে পৌঁছানোর মুহূর্তে ওর পা পিছলে যায়। বাক্সসহ চুড়কা জলের মধ্যে পড়ে যায়। শব্দ শুনে খান সেনারা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছোড়ে। গুলিতে গুলিতে চুড়কার শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। সেখানেই সে বীরগতি লাভ করে। একজন বিএসএফ তার মৃতদেহ বহন করে বাড়িতে নিয়ে আসে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কয়েকজন স্বয়ংসেবক জলকাদা ভেঙে ওর বাড়িতে পৌছাই। দেখলাম সঙ্ঘের হাফপ্যান্ট পরা চুড়কাকে উত্তর দিকে মাথা করে খাটিয়ার উপর শোয়ানো। বহু লোকের ভিড়। ওর নিথর শরীরে কাঁধে, বুকে, পাঁজরে, থাইয়ে অজস্র গুলির ফুটো। ১৯৭১সালের ভারত- পাকিস্তানের যুদ্ধে বঙ্গের প্রথম বলিদানীকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হুতাত্মার মর্যাদা দেয়নি। হুতাত্মার স্বীকৃতির জন্য বংশীদা ও আশিসদা বহু চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন। আজও চুড়কা সে মর্যাদা পায়নি। স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে চকরাম প্রসাদ গ্রামে চুড়কার সমাধিস্থানে একটি বেদী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি স্মারকস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। এতে চুকড়াকার প্রধান শিক্ষক হরেন চাকলাদারের ঐকান্তিক প্রয়াস ও সহযোগিতা ছিল। আজও প্রতিবছর চূড়কার বলিদান দিবসে ওর স্মৃতিতে তীরন্দাজি, বস্ত্র বিতরণ, শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজন করা হয়। চুড়কা মুর্মু স্মৃতি রক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। তাদের উদ্যোগে চূড়কার স্কুলের ছাত্রাবাসের নাম চুড়কার নামে রাখা হয়েছে।

আশির দশকে হিলির মুরারীপুকুরকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি শাখা শুরু হয়েছিল। বালুরঘাট নগরের শাখাগুলিকে ব্যবস্থিত করার জন্য ক্রমে গণব্যবস্থা, গটব্যবস্থা এবং বাড়ি থেকেই খাকি হাফপ্যান্ট পরে শাখায় আসার পথে স্বয়ংসেবকদের ডেকে নিয়ে আসার প্রথা চালু হলো। শাখায় আকর্ষক খেলা, গান, শুদ্ধ প্রার্থনা বলার অভ্যাস শুরু হলো। নতুন নতুন স্বয়ংসেবকদের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার কাজও চলতে থাকল। জেলা বা বিভাগের কোনো কার্যকর্তা শাখায় এলে তাঁরা প্রেরণাদায়ী গল্পের মাধ্যমে অনুশাসন, চরিত্রনির্মাণ সঙ্ঘের উদ্দেশ্য-আদর্শ নিয়ে পর বৈঠক নিতেন। শাখার উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সর্বোচ্চ সংখ্যা দিবসে পরিকল্পনা হলো শাখার মুখ্যশিক্ষক, সব শিক্ষক গটনায়করা নিজ নিজ গটে ধ্বজ-সহ নির্ধারিত সময়ে শাখা লাগাবে এবং গটনায়করা হবে সেদিনের মুখ্য শিক্ষক। ফল খুব ভালো হয়েছিল। পরবর্তীতে ভালো গটনায়কদের নতুন নতুন শাখায় মুখ্যশিক্ষক নিযুক্ত করা হলো। এই সঙ্গে শুরু হলো বিদ্যালয়ের টিফিনের সময় স্কুলে স্বয়ংসেবক ছাত্ররা একত্রিত হয়ে চন্দনের কার্যক্রমে অংশ নেবে অর্থাৎ সবার টিফিন একসঙ্গে করে সবাই ভাগ করে খাবে। এতে স্বয়ংসেবকদের মধ্যে একটি আত্মীয়তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ে বিএসসি পরীক্ষা নকশালদের পরপর আক্রমণে ভণ্ডুল হওয়ার দিন মুহুর্মুহু বোম চার্জ করায় এবং দোতলার উপর থেকে বহু যন্ত্রপাতি, চেয়ার, বেঞ্চ ফেলে দেওয়ায় প্রচণ্ড ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বোমার ধোঁয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন সিড়ি দিয়ে কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে নীচে নেমে সকলে পালাচ্ছে দেখে আমরাও ভয়ে প্রাচীর টপকে চিরতরে কলেজ থেকে বেরিয়ে এলাম। বিএসসি পার্ট-১ এর পরীক্ষা হলো না। পার্ট-২ এর পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ হলেও নকশালদের অত্যাচারে কোনো পরীক্ষাই হলো না। তখন বংশীদার আদেশে শিলিগুড়িতে দেবুদার (দেবব্রত সিংহ) কাছে হাজির হলাম। দেবুদা আমাকে সোজা কোচবিহারে নিয়ে গেলেন। কোচবিহারের হাজরাপাড়ায় 'রূপসী হাউস' বলে পরিচিত একটি প্রায় পরিত্যক্ত দালানঘরে জেলা কার্যালয়ে আমার ঠাঁই হলো। বর্ষাকাল। অবিরাম বৃষ্টি। প্রায় ২১ দিন পর সূর্যদেবের মুখ সকলে দেখল। বৃষ্টির জন্য মাঠের বদলে নিবাসেই (কার্যালয়) শাখা চলত। প্রথম দিনেই চঞ্চল দাস ও উদয় শঙ্কর সরকারের সঙ্গে পরিচয় হলো। দেবুদা বদুদাকে (সমীর কুমার গুহমজুমদার, যিনি নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন) আমাকে কোনো কলেজে ভর্তি করার দায়িত্ব দিয়ে অন্যত্র প্রবাসে চলে গেলেন। তাঁর চেষ্টা সত্বেও এ.বি.এন. শীল কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হওয়া হলো না। শেষে আমকে তিনি ইউনিভার্সিটি বি.টি. অ্যান্ড ইভিনিং কলেজে ভর্তি করে দিলেন। যেহেতু ওই কলেজে শুধু কর্মাস ও আর্টস্ পড়ানো হতো। তাই বাধ্য হয়ে পলিটিক্যাল সায়েন্স ও ইকনোমিক্স নিয়ে ভর্তি হলাম। বাংলা কম্পালসারি বিষয়। ওই কলেজে অধ্যাপক বি.বি.সি. (বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়)-র ওজস্বী ভাষায় মেঘনাদ বধ কাব্য পড়ানোর কথা আজও মনে আছে। সন্ধ্যায় ক্লাস থাকায় নিত্য শাখার দায়িত্বে থাকায় শহরের বিভিন্ন প্রান্তের শাখাগুলিতে উপস্থিত থাকার কোনো অসুবিধাই থাকল না। ওই সময় কোচবিহার জেলা প্রচারক ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত সেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন। তাঁর ঠাণ্ডা লাগার ধাত ছিল। ছোটবেলায় নাকি ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাঁকে উষ্ণ জলবায়ুস্থানে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কোচবিহারের আবহাওয়া অত্যন্ত আর্দ্র থাকায় হাত-পা ফোলার অসুখে আক্রান্ত হলে তাঁকে কলকাতায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তাঁর পরে কোচবিহার জেলা প্রচারক হয়ে এলেন অসিত ভট্টাচার্য। রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের মতোই তিনিও সঙ্ঘকাজে উৎসাহ প্রদান করতেন। সেসময় তুফানগঞ্জে অসিত খামারী, মাথাভাঙ্গায় রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক প্রচারক হিসেবে ছিলেন। দিনহাটায় বিদ্যার্থী বিস্তারক চন্দন ভৌমিক এবং কোচবিহার নগরে আমি ছিলাম।

মাঝে মধ্যে দেবুদার সঙ্গে জেলার বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তুফানগঞ্জের ক্ষিতীশদা তুফানগঞ্জ হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বাড়িতে যাওয়ারও সুযোগ হয়েছিল। শালবাড়ীর সুরেন্দ্রনাথ রায় কোঙারের বাড়ি গিয়েছিলাম। শালবাড়ী শাখায় প্রথম পরিচয় হয়েছিল হেমন্ত বর্মন, হেমন্ত ভকত, শঙ্কর বর্মন, নির্মল গোস্বামী (সাধুজী)-র সঙ্গে। সাধুজী সুরেনদার গুরুদেব ছিলেন। মাথাভাঙ্গার নিশিদা, জগদীশদা, সতীশ বর্মনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কলকাতার ডাঃ সুজিতদার শ্বশুরবাড়ি মাথাভাঙ্গায়। তিনি একবার শ্বশুড়বাড়িতে এলে ওই বাড়ি থেকে স্বয়ংসেবকদের জন্য একটি পাকা কাঠাল দেওয়া হয়েছিল। সেদিন দেবুদা ও রোহিণীদা ছিলেন। মাথাভাঙার পচাগড়ে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে একদিনের স্বয়ংসেবক সম্মেলন হয়েছিল। ৪০০ জনের উপর উপস্থিতি ছিল। অসিত ভট্টাচার্যের উৎসাহ প্রদানে কোচবিহার থেকে স্বয়ংসেবক ডাঃ শুভময় সরকারের উদ্যোগে ৮/১০ জন ডাক্তার ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

মনমোহনদা কোচবিহারে প্রায়ই প্রবাসে আসতেন। নিবাসের সামনের মাঠে শাখায় একদিন মাঠ ভর্তি স্বয়ংসেবক দেখে তিনি খুশি হলেন কিন্তু পরে বললেন, শাখায় শিশুই বেশি। কিশোর-তরুণদের উপস্থিতি সামান্যই ছিল। তিনি সতর্ক করলেন শাখায় গণব্যবস্থা ভালো করার সঙ্গে কিশোর-তরুণদের উপযোগী উৎসাহবর্ধক কার্যক্রম রাখতে হবে, নাহলে শিশুদের বেশি সংখ্যায় দেখে তারা শাখায় আসার উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। বললেন, 'শিশুরা অসময়ের বন্ধু কিন্তু সুসময়ের শত্রু'। শাখায় একেবারেই সংখ্যা কম থাকলে শিশুরাই শাখাকে জীবন্ত রাখে কিন্তু গণশিক্ষকদের সামলানোর সামর্থ্য না থাকলে শিশুরা শাখার অনুশাসন পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ।

আমার কোচবিহারে আসার অনেক আগে বংশীদা আমাকে মালদার মালতীপুর বিস্তারক পাঠিয়েছিলেন। ওই সময় বর্ধমানের মহন্তস্থলে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ চলছে। সময়টা বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পরের ঘটনা। আমি ওখানে পৌঁছানোর পর দেখলাম শাখার কার্যবাহ, মুখশিক্ষক, গণশিক্ষক, গট ব্যবস্থা স্বয়ংসেবকদের তালিকা সব থাকলেও শাখা বন্ধ। এতে আমি খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। সবেমাত্র ওখানকার স্বয়ংসেবক রঘুদা, পরেশদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মাত্র ১০/১৫ দিন হয়েছে। বংশীদার একটি চিঠি এল। আমাকে তৎক্ষণাৎ বর্ধমানে মহন্তস্থলে যেতে বলা হল। সঙ্গে কালো চশমা নিয়ে যেতে বললেন। বর্গের প্রচুর সংখ্যক কার্যকর্তা ও শিক্ষার্থী 'জয় বাংলা' রোগে আক্রান্ত হয়েছে। বর্গের আলোক বিভাগ, জল বিভাগ ও বসতি বিভাগের মতো তিনটি বিভাগের প্রবন্ধকের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হলো। ওইসব বিভাগের প্রবন্ধকেরা সকলেই চোখের অসুখে আক্রান্ত। শিক্ষার্থীদেরও অনেকেই আক্রান্ত। চিকিৎসা বিভাগে জায়গা নেই। বেশ কয়েকদিনের ব্যবধানে বেশিরভাগ কার্যকর্তা, স্বয়ংসেবক, শিক্ষার্থী সুস্থ হতে থাকল। বর্গে আলোকিত করার বিদ্যুতের মেন সুইচ ঘরটি ছিল একটি গোয়াল ঘর যা ওই পরিসরের সঙ্গে লাগোয়া একটি পাকা রাস্তা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ভোর সাড়ে তিনটার সময় আমি বিদ্যুতের মেন সুইচ অন করে দেখলাম গোয়ালের দরজায় দুটি গাই ও একটি বাছুর মরে পড়ে আছে। গোয়ালঘরের পরিসরেই সকলের জন্য স্নান ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। একটু বেলা হলে বোঝা গেল গোরুগুলির সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে। পরে গোয়ালের দেওয়ালের যেখানে মেন সুইচ ছিল সেখানে একটি গর্তে ২/৩ টি বিষাক্ত সাপ দেখা গেল। ওগুলির কী পরিণতি হয়েছিল তা আর মনে নেই।

ওই বর্গেই দত্তোপন্থ ঠেংড়ীজীর বৌদ্ধিক শুনেছি। তিনি বাঁশের তৈরি তীর-ধনুক নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভারতীয়দের প্রাচীন ধনুর্বিদ্যার বিষয়ে বক্তব্য রেখে— দীনদয়ালজীর একাত্ম মানবদর্শনের ওপর বৌদ্ধিক রেখেছিলেন। 'অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্' বলে একটি ছবির সাহায্যে বর্ণনা করেছিলেন কীভাবে ভারতীয় সমাজে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্রহ্মাণ্ডকে একই সূত্রে বেঁধে রাখার সংস্কৃতি কাজ করছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ব্যক্তি চরিত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমি সংস্কৃতিতে সকলেই বিচ্ছিন্ন। সেখানে মানসিকভাবে সকলেই অশান্তিতে। কিন্তু ভারতে শত কষ্টের মধ্যেও মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের হিন্দু সমাজকেই অগ্রগামী হতে হবে। হিন্দু সংগঠনে এই কাজের উপযুক্ত হওয়ার জন্য আমরা সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে যোগদান করেছি।

দেখতে দেখতে ১৯৭৫ সাল এসে গেল। সেবার সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ মালদার চাঁচলে শেষ হলো। সেখানে আমার কখনো গণশিক্ষক আবার কখনো প্রবন্ধকের দায়িত্ব পড়েছিল। খবর এল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন এবং সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সব কার্যকর্তা, প্রচারকদের নিজ নিজ কর্মস্থলে দ্রুত ফিরে যেতে বলা হলো। আমি সোজা কোচবিহারে ফিরে এলাম। ওই সময়ে আমি বিএ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। নিবাস বন্ধ হলো। রূপসী হাউস থেকে দুলালদার চেষ্টায় অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা হলো। ওখানেই দেবুদা, মনমোহনরা গোপনে আসতেন। প্রকাশ্যে সঙ্ঘের শাখা বন্ধ হলেও রাস্তায় চলতে চলতে বা কোনো নির্জন স্থানে প্রতিদিনের প্রার্থনা করার জন্য একত্রিত হতাম।

সমস্ত প্রচারক ছদ্মবেশে জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে ছোটো ছোটো দলে স্বয়ংসেবকদের সত্যাগ্রহ করানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সংবাদপত্রের সেন্সরশিপ করে সারা দেশে স্বয়ংসেবকদের উপর, তাদের উপর তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের প্রচণ্ড নিপীড়ন চলছে। লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণকে সামনে রেখে লোক সংঘর্ষ সমিতি নামে আন্দোলন শুরু হয়েছে। বিভিন্ন তারিখে কোচবিহার থেকে অসিত খামারীর নেতৃত্বে সুরেশদা, সাধুজী, নরেশ রায়, দেবাশিস দত্ত, দিনহাটা থেকে চন্দন ভৌমিক ও আমি; মাথাভাঙ্গা থেকে রোহিণীদা সত্যাগ্রহ করলাম। সকলের ঠাঁই হলো কোচবিহার জেলে। বিনা বিচারে সকলকে আটক করে মিশা ১৬/এ এর সঙ্গে ডিআইআর-এর বিভিন্ন ধারা প্রয়োগ করা হলো। বন্দি অবস্থায় রোহিণীদার পিতৃবিয়োগের সময় প্যারোলে তাকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। দেবুদা ও

মনমোহনদাকে দার্জিলিং জেলে রাখা হলো।

জেলের বাইরে থাকা কার্যকর্তারা সারা ভারতে কংগ্রেস সরকারের নির্মম, নিষ্ঠুর অত্যাচার যেভাবে স্বয়ংসেবকদের উপর নেমে এসেছিল তার বিবরণ-সহ জরুরি অবস্থা-বিরোধী আন্দোলনের খবর নিয়ে যে বুলেটিন গোপনে পৌঁছাত সেগুলি সমাজের প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজ করছিলেন। জেলবন্দি আমাদের সঙ্গে দেখা করার অজুহাতে চিড়ের ঠোঙ্গার তলায় পট্টির মধ্যে সেসব বুলেটিন পৌঁছাত। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য দুলাল ধরের ছোটো বোন গৌরী ও দীপক সরকারের মাকে এই কাজে লাগানো হয়েছিল। গৌরীকে আমার ছোটো বোনের এবং দীপকের মাকে আমার মায়ের পরিচয়ে জেলখানায় দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই ঝুকিপূর্ণ কাজে প্রত্যক্ষভাবে বন্ধুবর চঞ্চলদা, উদয়দাদের মতো কার্যকর্তারা ছিলেন। কয়েকবার তাঁরা জেল গেটে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছেন। জেলে রুটিন করে আসন, গীতাপাঠ এবং সঙ্ঘের প্রার্থনা চলছিল। ওটাকে আমরা সঙ্ঘের জেটিসি (জেল ট্রেনিং ক্যাম্প) বলতাম। হল ঘরে বহু সংখ্যক বন্দির সঙ্গে আমাদের ঠাঁই হয়েছিল। সব বন্দি আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন। তুফানগঞ্জের বন্দি ও কয়েদি সুরেন বর্মনের বিরুদ্ধে প্রায় ৮টি গুরুতর মামলা ছিল। একবার অসিত খামারী অতিরিক্ত জল খেয়ে অসুস্থ হলে 'শিকলবেরি' অবস্থায় ডাকাত সুরেন বর্মণ পীঠে করে জেলের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। কয়েকমাস কারাবাসের পর আমাদের ৮ জনকেই সপ্তাহে একটি করে পোস্ট কার্ড বরাদ্দ হওয়ায় জেল থেকে জেলবন্দি পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীবালাসাহেবজীকে তিহার জেলের ঠিকানায় চিঠি লিখলে যথা সময়ে তিনি তার উত্তরও দিয়েছিলেন। দার্জিলিং জেলে বন্দি দেবুদা ও মনমোহনদার সঙ্গেও পত্রালাপ হতো।

জেলে বসে আমি বিএ ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি। চন্দন ভৌমিকও পড়াশোনা শুরু করেছিল কিন্তু কয়েক মাসেও যখন কারামুক্তি হলো না, তখন ও হতাশায় পড়াশোনা বন্ধ করে দিল। জেল গেটে সেন্সর করিয়ে চঞ্চল দাস আমাদের কাছে বইপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। বন্ধুবর চঞ্চলদা আমার অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা করে আমাকে সকল বিষয়ের সম্ভাব্য প্রশ্নমালিকা পাঠাত। সেই সম্ভাব্য প্রশ্নমালা ও বইপত্র যা চঞ্চলদা আগেই পাঠিয়েছিল তাকে ভর করেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতিতে জেলেই পরীক্ষা দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে জরুরি অবস্থা অবনানের একমাস আগেই আমার বিএ পাশের মার্কশিট চলে এল। জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট আমাকে ডেকে মার্কশিট আমার হাতে তুলে দিয়ে ধন্যবাদ জানালেন। এখানে একটি কথা না বললেই নয় তা হলো বদুদা ও চঞ্চল দাসের প্রতি আমার চির কৃতজ্ঞতা। তাঁরা সহায়তা না করলে আমার বিএ পাশ করা হতোই না।

কারামুক্তির পর আমার আস্তানা হলো শিলিগুড়ি। দেবুদার (ডাঃ দেবব্রত সিংহ) নির্দেশে বিমলকৃষ্ণ দাসের সঙ্গে আমাকে দিয়ে শিলিগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র খালপাড়ার মিলনপল্লীতে সত্যনারায়ণজীর ব্যবস্থাপনায় 'সারদা শিশুতীর্থ' নামে আগের সরস্বতী শিশুমন্দির জরুরি অবস্থায় যেটিকে সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল নাম বদলে পুনরায় পূর্বস্থানেই বিদ্যালয় শুরু করানো হলো। সালটা ছিল ১৯৭৭। সেই থেকে আমি সরস্বতী শিশুমন্দিরের আচার্য হলাম এবং একাদিক্রমে ১৩ বছর শিলিগুড়ির সারদা শিশু তীর্থে ছিলাম।

দেশে জরুরি অবস্থা অবসানের পর শিলিগুড়িতে সঙ্ঘের কার্যালয়ের জন্য কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চাইত না। এমারজেন্সির আগে হাকিমপাড়ায় চিলড্রেন পার্কের কাছে যে বাড়িতে নিবাস ছিল তারাও না করে দিল। অগত্যা প্রচারক-বিস্তারকেরা এদিক- সেদিক ভাড়া নিয়ে থাকছি। কার্যকর্তাদের নজরে এল হাকিমপাড়ার ২৯ নং বলাইদাস চ্যাটার্জি রোডে এক বাড়ি যেখানে কোচবিহারের স্বয়ংসেবক দুলাল ধর ভাড়া থাকেন। সেটি একটি মেসবাড়ি। আই টি আইয়ের শিক্ষকরা ওখানে থাকেন। দুলালদাও আইটিআইয়ের শিক্ষক। সকলেরই সরকারি বদলির চাকরি। দুলালদার সঙ্গে কথা বলে দেবুদা ও শ্যামলালদা সিদ্ধান্ত নিলেন যিনি বদলি হবেন তার স্থানে এক এক করে আমরা গিয়ে ঢুকব। সেইমতো একজনের বদলির পর আমাকে প্রথমে পাঠান হলো। কিছু সময় পর বিমলকৃষ্ণ দাসও এলেন। এইভাবে মেস খালি হলেই আমরা গিয়ে ঢুকতে ঢুকতে শেষে দুলালদাও বদলি হয়ে কোচবিহার চলে গেলেন। সম্পূর্ণ বাড়িটিই তখন আমাদের দখলে। যেহেতু দুলালদার নামে বাড়ি ভাড়া ছিল তাই তাঁর নামেই ভাড়া সঙ্ঘের পক্ষ থেকে দেওয়া হতো। এভাবে কিছুদিন চলার পর বাড়িওয়ালার সঙ্গে অনেক দলদামের পর শ্যামলালদার উদ্যোগে বাড়িটি ৩ লক্ষের কিছু বেশি টাকায় কেনা হলো। পাকা ছয় কামরাবিশিষ্ট টিনের চালের বাড়িটি পার্টিশন করে ২টি ভাগে বিভক্ত ছিল। উভয় অংশেই পায়খানা ও রান্নাঘর আলাদা ছিল। ওই বাড়িতে প্রচারকদের সঙ্গে ডাঃ দেবেশ বিশ্বাস, তপন কুমার বৈদ্য, অমিত চৌধুরী, বিবেকানন্দ চৌধুরী, বিকাশ ঘোষ, আমি ও বিমলদা ছিলাম। বাড়ির মাঝের প্রচীরের ঠিক মাঝখানে একটি কুয়ো ছিল। সেটির জলে আমাদের সঙ্গে পাড়ার অনেকের খাওয়ার জলের ও অন্য কাজের জোগান হতো।

পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ প্রান্তের স্বয়ংসেবকদের আর্থিক সহায়তায় সেখানেই বর্তমান উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয় 'মাধব ভবন' তৈরি হয়েছে। এই নির্মাণ কাজেও অর্থ সংগ্রহে কুলছত্র প্রসাদ আগরওয়ালা, শঙ্কর আগরওয়াল, সত্যনারায়ণ আগরওয়াল, জগদীশ প্রসাদ আগরওয়াল, জগদীশ কিরানাওয়ালী,রামকুমার আগরওয়াল, ওমপ্রকাশ আগরওয়াল, বরেন কুণ্ডু, রঘুনন্দন খৈতান, শ্রীহনুমান সারাওগী এবং শ্রীপবন নাকিপুরিয়া অন্যতম। প্রচারক বিজয় বর্মণকে ভবন নির্মাণের তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

শিলিগুড়িতে অবস্থানকালে এক হৃদয় বিদারক খবর এল বালুরঘাটের অদূরে মুরারীপুর গ্রামের শাখায় আরএসপি-সিপিএম পার্টির গুন্ডারা আক্রমণ করে শিশু গণশিক্ষক প্রশান্ত কুমার মণ্ডলকে হত্যা করে। বহুদিন পর তাঁর এক স্মরণসভায় মুরারীপুর গিয়েছিলাম। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈত চরণ দত্ত ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বালুরঘাটে জেলা সঙ্ঘ কার্যালয় 'পাঞ্চজন্য' তৈরির সময় স্বর্গীয় প্রশান্ত মণ্ডলের পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বড়ো অঙ্কের অর্থ সমর্পণ করা হয়েছে। সঙ্ঘ তথা দেশমাতৃকার মুখোজ্জ্বলকারী এই পরিবারের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

(লেখক দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের প্রবীণ স্বয়ংসেবক)

‘বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব’ পুস্তকে বাঙ্গালিকে আয়না দেখিয়েছেন ডাঃ কালিদাস বৈদ্য

তাপস দে

জাতীয় জীবনে যুদ্ধ ও সংগ্রামের বড়ো ঘটনা সবাই তাদের সমষ্টিগত দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেন এবং ফলাফল জানতে পারেন দৃশ্যমান পরিবর্তন থেকে। যুদ্ধে জয়-পরাজয় থাকে। জয়ী পক্ষ তাদের নিজের জন্য ইতিহাস লেখে, সেগুলো স্কুল-কলেজের ছাত্রদের পড়তে হয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কমিশন বসলে অনেক সত্য সামনে আসে, আবার যে পক্ষের নেতৃত্বে যুদ্ধে জয় এসেছিল, রাজনীতিতে কয়েক বছর পর তাদের পরাজয় ঘটলে, অন্য পক্ষ ঘটনার এমন একটা দিক তুলে ধরে যা আগে জানা ছিল না। বিবদমান দু’পক্ষের বাইরে তৃতীয়-চতুর্থ পক্ষের ভূ-রাজনীতি, আধিপত্য, প্রভাব লাভ করা বা হারানো, আন্তর্জাতিক পরিবহণ/ব্যবসার রুট এবং সেগুলো অক্ষুণ্ণ রাখা, এগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতা/রাষ্ট্রদূতদের যোগাযোগ, যার ভিত্তিতে বড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেগুলি থাকে ক্লাসিফায়েড তথ্য হিসেবে যেগুলো প্রকাশ পায় বহু বছর পরে।

আবার একজন প্রভাবশালী নেতা, হয়তো সংগ্রামে অনেক রাজনৈতিক অবদান ছিল, কিন্তু তিনি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁর অবদান স্বীকার করলে জনগোষ্ঠীটি এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষার বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে যায়, সে বিবেচনায় এ বিষয়ে নীরবতা পালন করা হয় এবং তার নাম স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে জায়গা পায় না, কালিদাস পড়েন এই ক্যাটাগরিতে। জনগণের চোখের সামনে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্বে যদি শেখ মুজিবুর থাকেন এক নম্বরে, তবে তার পরেই আসেন ডাঃ কালিদাস বৈদ্য ও চিত্তরঞ্জন সুতার। বাংলাদেশের বাকি রাজনৈতিক নেতা, আমরা যাদের নাম জানি, তাদের ভূমিকা অনেক গৌণ। আর যদি পর্দার আড়াল থেকে নেতৃত্বের কথা বলেন, তবে কালিদাস ও চিত্ত সুতারের ভূমিকা শেখ মুজিবুর থেকে কম নয়।

এই প্রতিবেদক ইতিহাসের গবেষক নয়; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অজস্র দলিল দস্তাবেজও ঘাঁটাঘাঁটি করেননি। কালিদাস

বৈদ্যের জন্ম বরিশালের সামন্তগাতী গ্রামে ১৯২৮ সালে। যখন, যে জায়গায়, হিন্দুরা সবদিক দিয়ে শক্তিশালী ছিল, এমনকী মুসলমানদের সঙ্গে মারামারিতেও, আর মুসলমানরা পিছিয়ে ছিল সেই সময়ে তাঁর জন্ম। কাজেই দীর্ঘদিন হিন্দু হিসেবে অত্যাচারিত হয়ে যে হীনম্মন্যতা বোধ জন্মায় বা বেড়ে উঠার সময় এ মানসিকতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। তিনি রাজনীতি সচেতন ছিলেন— যোগেন মণ্ডলের মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে পাকিস্তান তৈরির রাজনীতি সম্পর্কে জানতেন। ৪৭-এর দেশভাগ দেখেছিলেন, ৫০-এ সরকারি মদতে পূর্ববঙ্গে ভয়াবহ হিন্দু অত্যাচার এবং তার ফলে হওয়া শরণার্থীদের কলকাতায় দেখে সমমনা কয়েকজনকে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেন— পাকিস্তানে ফেরত এসে পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের উপর হওয়া ৪৭-এর অন্যায়ের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কাজ করবেন এবং তা দীর্ঘ সময় ধরে করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের ধারণা (ঘোষণার কথা বলছি না) আসে ডাঃ কালিদাস বৈদ্য এবং চিত্তরঞ্জন সুতারের মাধ্যমে যাঁরা ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু, শেখ মুজিবুরের কাছ থেকে নয়। তাঁদের জন্ম-কর্ম সবই বরিশাল ও ঢাকায়। তাঁরা দুজনই মুজিবুরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু তাঁরা করতেন হিন্দুদের নিরাপদে বেঁচে থাকার রাজনীতি, যে জন্য কয়েকজন সমমনা হিন্দু প্রতিজ্ঞা করে ১৯৫০-এ কাজ শুরু করেছিলেন, যেটা আজও আমরা চাই। কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে মুজিবুর ও কালিদাস-চিত্ত কেউ কাউকে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু যেখানে একসঙ্গে কাজ করা যেত সেখানে তা তারা করেছেন।

কালিদাস কোরান পড়েছিলেন। জেহাদ ও হিন্দুদের উপর অত্যাচারের মজহবি অনুপ্রেরণা ভালো বুঝতেন। পাকিস্তান আমলে সরকারের সিদ্ধান্তে হিন্দুদের উপর ব্যাপক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কালিদাস এবং চিত্ত সাধারণ হিন্দুদের মোটামুটি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার উপায়। এগুলো অনেকগুলি বড়ো সভার মাধ্যমে হয়নি, কয়েকজন হিন্দু নেতা আলাপ আলোচনা করে এগুলি ঠিক করেছিলেন এবং গল্পের মাধ্যমে এগুলি মুখে মুখে ছড়িয়েছিলেন। এখনকার মতো তখন সেরকম সভা করে জানানোর পরিবেশ ছিল না এবং দেশদ্রোহিতার মামলার ভয়ও ছিল।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুর সংখ্যা তখন অনেক বেশি ছিল। কালিদাস ও চিত্ত মুজিবকে বলেছিলেন দক্ষিণ রাজনৈতিকভাবে তারা মুজিবুরকে দিতে পারবেন, মুজিব ভেবেছিলেন দক্ষিণ পেলে উত্তরও পাবেন এবং নির্বাচনে জয় কেউ ঠেকাতে পারবেন না।

ইসলামি বাংলাদেশ পেলে তাদের

অর্থনৈতিক উন্নতি হবে— এই লোভে তারা স্বায়ত্তশাসন চায়, হিন্দুরা চায় নিরাপত্তা— মানে হিন্দুদের দাবি অনেক বেশি মুখ্য। একথা তাঁরা মুজিবুরকে বলেছিলেন। '৬৪-তে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুজিবুর প্রতিবাদ করেছিলেন। এছাড়া মুজিবের পুরো রাজনৈতিক জীবনে হিন্দুদের জন্য বিশেষ কিছু করার প্রমাণ নেই। ৬৬-র ৬ দফা মুজিবুর লাহোরে ঘোষণা করেছিলেন, আওয়ামি লিগের রাজনীতির অনেকেই এর পক্ষে ছিল না।

ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালে হবু নির্বাচনের ৪টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন। প্রথমটিতে সবাই ভোট দিতে পারবে এটি ছিল। বাকি তিনটি ছিল ইসলাম সম্পর্কিত। এখনকার মতো এর কোনো প্রতিবাদ আওয়ামি লিগ-সহ অন্য কোনো রাজনৈতিক দল করেনি। এই ইসলামিক উদ্দেশ্যগুলির বিরোধিতার জন্যই কালিদাস হিন্দুদের নিয়ে গণপরিষদ নামক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। কালিদাস ৬৯ সালে ঢাকায় সংখ্যালঘু সম্মেলন করেন। কুমিল্লার সম্মানিত ধীরেন্দ্র দত্ত এর বিরোধিতা করেন এবং বলেন সবার উচিত মুজিবুরের পাশে থাকা। সম্মেলন বানচাল করার একটা চেষ্টাও হয়। কালিদাস পরে জানেন এতে মুজিবের হাত ছিল। নির্বাচনে সংখ্যানুপাতে হিন্দুদের জন্য কালিদাস মুজিবুরের কাছে ৩৬টি সিট চান, মুজিবুর দেন একটি। গণপরিষদের একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পাশ করেন এবং গণপরিষদ নির্বাচনে আওয়ামি লিগের পক্ষে কাজ করে।

৬০-এর দশকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙ্গালির স্বায়ত্তশাসনের জন্য ব্যাপক আবেগ ও অনুপ্রেরণা তৈরি হয়েছিল। মুজিবুর ছিল তার প্রতিনিধি। যে ব্যাপক জনজাগরণ তৈরি হয়েছিল তার সরাসরি বিরোধিতা একজন জননেতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ প্রশ্ন আসছে কেন?

৭০-এর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর মুজিবুর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকেন, কিন্তু বুঝতেন ক্ষমতার কেন্দ্রগুলো সব পঞ্জাবে এবং তারা তাকে তা হতে দেবে না। পাকিস্তান ভাঙা তার পক্ষে আদর্শগতভাবে কঠিন, কারণ সে কলকাতার দাঙ্গায় অংশ নেওয়া পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু নিধনের নায়ক সোহরাওয়ার্দির ডান হাত হিসেবে সারা জীবন রাজনীতি করেছে।

৭ মার্চের সভায় সবাই বলতে থাকে মুজিবুর তুমি স্বাধীনতার ঘোষণা দাও। আজ আমরা এটিকে স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে জানি। সে সময়ের অনেকের মতে মুজিবুর সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা সে ভাষণে দেয়নি।

কালিদাস মুজিবুরকে ভারতে আত্মগোপন করতে বলেন। তিনি বলেন— 'কবিরাজ (এই নামেই ডাকতেন), আমি ভারতে থেকে স্বাধীনতা পরিচালনা করব না।'

৭ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে ইয়াহিয়ার সঙ্গে মুজিবের বৈঠক হয়। এই সময়ের মধ্যে মুজিবুর গ্রেপ্তারও হয় না। তাজউদ্দিন-সহ সবাই আত্মগোপনে গিয়ে পরে ভারতে যেতে পারলে মুজিবের সমস্যা কী ছিল? ২৫ মার্চের দু-একদিন আগে তাজউদ্দিন-সহ সবাই মুজিবের কাছে স্বাধীনতার লিখিত ঘোষণা চান, যেটা তিনি দেন না— একথা তাজউদ্দিন কালিদাসকে বলেছিলেন। জনতার দাবি সরাসরি অগ্রাহ্য না করতে পেরে তিনি নিঃসন্দেহে ইয়াহিয়ার সঙ্গে একধরনের বোঝাপড়ায় গিয়েছিলেন— তার গ্রেপ্তার সাজানো।

চিত্ত সুতার ছিলেন শেখ মুজিবুরের ঘোষিত প্রতিনিধি। যুদ্ধের অনেক আগেই তার জন্য কলকাতায় বিশাল বড়ো বাড়ির ব্যবস্থা করা হয়, যে বাড়িতে এসে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের অনেকে পরে আশ্রয় নেয়। কালিদাস বলেছেন মুজিবের মাধ্যমে পাকিস্তান ভাঙা ছিল ভারতের পরিকল্পনা, মুজিবের শেষ সময়ের অসহযোগিতায় তারা তাজউদ্দিন-সহ অন্যদের মাধ্যমে করেন--- এটি ঘটনা পরম্পরায় বিশ্বাসযোগ্য।

বাঙ্গালি পরিচয় যদি প্রধান ও একমাত্র হয়, যেটা ষাটের দশকে হয়ে উঠেছিল, তবে ইসলামি পরিচয়ের পাকিস্তান টিকিয়ে রাখা যাবে না— এটাই মুজিবুর এবং ইয়াহিয়ার মূল ভয় ছিল বলে কালিদাসের বিশ্বাস।

কালিদাস বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া নিয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাঁর শঙ্কা ছিল হিন্দুরা এ থেকে কিছু পাবে না। সেজন্য তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। বাংলাদেশ স্বাধীনের জন্য মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং তো চলছিল, কিন্তু পরে কোনো কাজে লাগবে ভেবে শরণার্থী শিবির থেকে শুধু ২৪০০ হিন্দুযুবক নিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

১৯৭১ সালের ২৮ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সরকার গঠনের একটি ঘোষণা আসে। ভারত আঁচ করে মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হবে, অস্থায়ী সরকারের সবাই এসে তাতে যোগ দেবে, তাই তার আগে তারা বাংলাদেশ স্বাধীন করে ফেলে।

মুজিবুরের আরও কয়েকটি ইসলামি কার্যকলাপ :

যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার ৫০ ও ১০০ টাকার নোট নিষিদ্ধ করে। মূলত হিন্দুরা এই টাকা নিয়ে ভারতে রিফিউজি ক্যাম্পে উঠেছিল। ৭১-এর অস্থায়ী সরকার বারবার বলেছিল দেশ স্বাধীন হলে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হবে। এ কাজ মুজিবুর করেনি।

মুজিবুর বাংলাদেশকে পাকিস্তানের ধারাবাহিকতার দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। এত মানুষের আত্মত্যাগের পরে কীভাবে তা হয়? যে কারণে শত্রু সম্পত্তির মতো আইন বহাল রয়ে যায়।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সবাই তো বিদ্রোহ করেনি, যারা করেনি, তারা বাঙ্গালি গণহত্যায় অংশ নিয়েছিল। তাদের বিচার না করে তাদের বাংলাদেশ আর্মিতে ঢোকানো হলো কেন? যুদ্ধাপরাধীদের বিচার— তিরিশ লক্ষের আত্মত্যাগ (কালিদাস বলছেন এর ৯৫ ভাগ হিন্দু, আমি বিশ্বাস করি এর অধিকাংশই হিন্দু। তাই যদি না হবে তবে শরণার্থী শিবিরে ৮০ ভাগ কেন হিন্দু ছিল, প্রাণের ভয় সবার থাকে)— বিচার হলে পাকিস্তানের নাক কাটা যেত, কিন্তু এরা হিন্দু বলেই কি মুজিবুর এদের বিচারে উৎসাহী ছিল না?

'৭০-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি যদি হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল, যে স্বাধীনতার ৩০ লক্ষ বীরগতিপ্রাপ্তদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু, তবে '৪৭-পূর্ব ৮০ ভাগ জমির মালিকানা বাদ দিয়েও বলা যায়, রক্তে কেনা এদেশ তো আমাদের। আশ্চর্য নয় যে এই বই আগে পড়তে পাইনি। বাংলাদেশ ছিল ৭-৮ বছরের আবেগ, তারপরেই তা আবার পাকিস্তানে পরিণত হয়। আমাদের এই প্রক্রিয়ায় আবারও ব্যবহার করা হয়। '৪৭-এ ছিল যোগেন মণ্ডল, '৭১-এ মুজিবুর। হিন্দুরা সাবধান! সাধু ছাড়া অন্যদের সহজে বিশ্বাস করবেন না। □

(৫২)

গল্পকথায় ডাক্তারজী

সংকট মোচন (২)

বিপ্লবী কাজের সময় সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র অত্যন্ত গোপনে সরিয়ে দেওয়ার কাজ চলছিল। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৬-২৭ পর্যন্ত এই কাজ চলতে থাকে। এই সংকট পূর্ণ কাজে অত্যন্ত বিশ্বাসী, সাহসী ও সামর্থ্যবান লোকের প্রয়োজন হয়। ডাক্তারজী-ঘনিষ্ঠ গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন তেমনই ব্যক্তি। পঞ্জাবের কাজ শেষ করে তিনি নর্মদা তীরে তাঁর এক সন্ন্যাসী ভাইয়ের কাছে তিনি থাকা শুরু করেন। নিজেও সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন। ১৯২৭ সালের দিকে নাগপুরে খবর এল হোসেঙ্গাবাদের কাছে তিনি খুব অসুস্থ অবস্থায় আছেন। অবিলম্বে তাকে চিকিৎসার জন্য ওয়ার্ধায় নিয়ে আসা হলো। তাঁর ছোটো ভাই আনন্দী প্রসাদ সেখানে গোরক্ষক সংস্থায় চাকুরি করতেন। তার বাড়ি স্টেশন থেকে একটু দূরে থাকায় পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সুবিধা হবে ভেবে তাকে সেখানেই রাখা স্থির হলো। তখনও তিনি গেরুয়া পোশাক পরতেন। বিপ্লবী মানসিকতার অত্যন্ত তেজস্বী ব্যক্তি তিনি, তাই ওপরে যেমন হোক ভেতরের আগুনের শিখা ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল। যদি কখনও বিরোধী বা বিপরীত পরিস্থিতির নির্মাণকারী কোনো ব্যক্তি সামনে এসে পড়ে তবে তাকে খতম করে পালিয়ে যাবেন।

এই সতর্কতায় গেরুয়া আলখাল্লার নীচে সর্বদা একটি পিস্তল, কার্তুজ আর ছোরা লুকিয়ে রাখতেন। বাকি সব সরিয়ে নিলেও এই ভরসা হাতছাড়া করেননি। অসুস্থতার সময় এক বন্ধু তার সেবাযত্নের জন্য এসে কথাবার্তায় এই অস্ত্রের কথা জেনে ফেলে আর হাতে পিস্তলটি নিয়ে নাড়াচাড়াও করে। কয়েকদিন পরে হঠাৎ শোনা গেল হিঙ্গনঘাট রেলস্টেশনের কাছে কিছু ব্যক্তিকে পিস্তল বহন করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শঙ্কিত হলেন গঙ্গাপ্রসাদ, দেখলেন তাঁর আলখাল্লার মধ্যে পিস্তল আর কার্তুজ নেই, দিকভ্রান্তের মতো ওই অবস্থায় ছুটে গেলেন সেই বন্ধুর বাড়ি। পিস্তল, কার্তুজ ফেরত নিয়ে, অত্যন্ত উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন তিনি। বন্ধুকে সতর্ক করলেন— ‘যদি কেউ এর কথা জানে তবে তুমি রেহাই পাবে না মনে রেখো’। সরকারি বিভাগে থাকা ডাক্তারজীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের মাধ্যমে জানা গেল এ ব্যাপারে সরকারের সন্দেহের তালিকায় সর্বাগ্রে নাম রয়েছে ডাক্তারজীর। ঘটনার খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারজীর চোখে গঙ্গাপ্রসাদের ছবি ভেসে উঠলো। তার উগ্র মেজাজ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন।

ডাক্তারজী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন, নিজের জন্য নয়, এই ভেবে যে, যদি কোনো মতে গঙ্গাপ্রসাদ অস্ত্র-সহ ধরা পড়ে, তাহলে অন্যত্র নানা স্থানে হাতিয়ারের এবং বিপ্লবীদের গোপন তথ্য সরকারের কাছে ফাঁস হয়ে যাবে। সঙ্ঘ জড়িয়ে যাবে। দিন তিনেক পরে হঠাৎ রাত ৮টা নাগাদ ওয়ার্ধায় ডাক্তারজী আপ্পাজীর বাড়িতে হাজির হলেন। ডাক্তারজী জানতেন চারিদিকে গোয়েন্দার লোক রয়েছে। এখনও তারা আশেপাশে আছে। এত পরিচিত হওয়ায় লুকিয়ে চলাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আপ্পাজী গোয়েন্দা অজুহাত দেখিয়ে একটু দেরি করতে বললেও তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে তাকে নিয়ে ডাক্তারজী চললেন গঙ্গাপ্রসাদের উদ্দেশে। তাঁর বাড়ির কাছে এসে সামান্য দূরে একটা নিমগাছের আড়ালে বসে আপ্পাজীকে ভেতরে পাঠালেন। গঙ্গাপ্রসাদ দেখেই বুঝলেন এবং ডাক্তারজীর কথা শুনে মুহূর্তে পিস্তল কার্তুজ তার হাতে দিয়ে দিলেন। আপ্পাজী নিমগাছের কাছে এসে পিস্তলটি ডাক্তারজীর হাতে দিতেই অন্ধকারে পেছন থেকে একজন ডাক্তারজীকে জড়িয়ে ধরলেন আর বলে উঠলেন ‘কী, এবার তো হাতেনাতে ধরে ফেলেছি, এবার ফাঁকি দেবেন কীভাবে?’ চকিতে ডাক্তারজী হাত ছাড়িয়ে পিস্তলটি আপ্পাজীর হাতে দিয়ে গোয়েন্দা বীরপুঙ্গবকে মাটিতে শুইয়ে ক্রমাগত কিল ঘুষিতে তাকে বরণ করতে লাগলেন। বিশালদেহী ডাক্তারজীর হাতে মার খেয়ে সে কাঁদতে শুরু করল। ভুল হয়ে গেছে স্যার, ছেড়ে দিয়ে দিন, কাউকে কিছু বলবো না’। ডাক্তারজী তাকে ছেড়ে দুহাত দেখিয়ে বললেন— ‘দ্যাখ, আমার হাতে কিছু আছে।

ওকে ছেড়ে চলে গেলেন ডাক্তারজী। সবার ওপর থেকে একটা বিরাট সংকট কেটে গেল। ভোরের ট্রেনে নাগপুর ফিরে সকলের সঙ্গে মিলে আবার নিত্যকার কাজে লেগে গেলেন। কোথাও গল্প নয়, কোথাও কথা নয়, কেউ জানলো না আগের দিন রাতের ঘটনা।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস